আল কুরআনে নারী

প্রথম খন্ড

অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন

আল কুরআনে নারী

প্রথম খণ্ড

অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ২৯১

১ম প্রকাশ

জিলহাজ্জ	১৪২২
ফাল্গুন	১৪০৮
ফেব্রুয়ারী	২০০২

বিনিময় ঃ ৮২.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Al-QURANE NARE by Prof. Mohammad Mosharraf Hossian. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 82.00 Only.

প্রাসংগিক কথা

আল কুরআন আজকের দুনিয়ায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একমাত্র নির্ভুল বাণী-সম্ভার। কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির পথনির্দেশিকা হিসেবে একক গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ আল কুরআন মানবজাতির জন্য আল্লাহর মহান এক নি'আমত। পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। মহাকাশ ও মহাবিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টিরাজি এ মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই নিয়োজিত। দুনিয়ার জীবন সুচারুরূপে ও সুবিন্যস্তভাবে অতিবাহিত করে আখেরাতের জীবনে সার্বিক কল্যাণ ও পূর্ণ সাফল্য অর্জনের তথা রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের পথে চলার একমাত্র আলোকবর্তিকা এ আল কুরআন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে আল কুরআনই সঠিক পথের দিশা দিয়ে থাকে।

নারী-পুরুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই প্রিয় সৃষ্টি। আল্লাহর রহমত ও দানের ব্যাপারে তিনি যেমন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি, তেমনি তাঁর বিধানে নারী-পুরুষের অধিকার ও মর্যাদার মধ্যেও কোনো তারতম্য রাখেননি। মহান আল্লাহ পুরুষদের জন্যে যেমন অপার করুণার আধার, তেমনি মহিলাদের জন্যেও তাঁর দয়া সীমাহীন। সংকীর্ণ দৃষ্টির কোনো মানুষের চোখেই বিভিন্ন কারণে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকতে পারে। কারণ, মানুষের জন্যে তো কেউ আপন, কেউ পর, কেউ কাছের আর কেউ দূরের হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর চোখে তো সকল মানুষই সমান—আল্লাহর তো কেউ আপন, কেউ পর, কেউ কাছের, কেউ দূরের নেই। সুতরাং আল্লাহর বাণী আল কুরআনে নারী পুরুষ সকলের জন্যেই সমান কল্যাণকর বিধান দেয়া হয়েছে।

আজকের বিশ্বে ইসলাম বিদ্বেষীরা নারী অধিকার ও নারী মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ব্যাপদেশে ইসলামকেই দায়ী করে থাকে। মানব ইতিহাসে একমাত্র যেই ইসলাম নারীদের প্রকৃত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে সেই ইসলামকেই ওরা দায়ী করছে নারী মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার দায়ে ! আশ্চর্যের ব্যাপর হলো, এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবি নামধারী মুসলিমগণও এ নির্জলা মিথ্যার বেসাতি করে বেড়াচ্ছে আজকের সমাজে। তারা বিভ্রান্ত করে ছাড়ছে আধুনিক বিশ্বের নতুন প্রজন্মকে। অথচ তাদের মনগড়া পথ নারী সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে পশুত্বের এক মারাত্মক ও ঘৃণ্য পর্যায়ে।

আল্লাহর বাণী আল কুরআন ও রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ সমন্বয়ে সুবিন্যস্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান আল ইসলাম নারী-পুরুষের সার্বিক কল্যাণ নির্দেশ করেছে। 'নারী' বিষয়ে অনেক লেখক ও চিন্তাবিদের লেখা গ্রন্থরাজি বাজারে চালু

রয়েছে। "আল কুরআনে নারী" শীর্ষক বইটি সে ধরনের একটি বই নয়। বরং কুরআন শরীফে 'নারী' উল্লেখে যেসব আয়াত রয়েছে, সেসব আয়াত চয়ন করে তা থেকে উল্লেখযোগ্য আয়াতসমূহ বাছাই করে বিভিন্ন তাফসীরের আলোচনা থেকে এ বইটি লিখা হয়েছে। এজন্যে বইটিতে গতানুগতিক রীতিতে কোনো বিষয়ের অধীনে সংশ্লিষ্ট আয়াত নিয়ে আলোচনা করা হয়নি ; বরং আয়াতের অধীনে সেই আয়াতে সন্নিহিত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর বাণীর ভাবার্থ এতই ব্যাপক যে একই আয়াত থেকে বহুবিধ বিষয় বের করা যায় বিধায় একটি আয়াত কেবল মাত্র একটি বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া বৈধ বা সমীচীন মনে করিনি। এ কারণেই শিরোনামের নীচে আয়াত না লিখে, প্রচলিত রীতির খেলাফ আয়াতের নীচে শিরোনামের উল্লেখ করা হয়েছে। এতেকরে একই আয়াতের অধীনে উল্লিখিত শিরোনাম ছাড়াও যেন প্রয়োজনে অন্যান্য শিরোনাম ব্যবহারের অবকাশ থাকে বা অন্য কোনো বিষয়ের সাথে আয়াতটিকে সংযুক্ত করা যেতে পারে। কারণ, কিয়ামত পর্যন্ত যে কোনো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সমস্যাদির যেসব সমাধান আল কুরআনের আয়াতগুলোতেই বিদ্যমান রয়েছে, তা যেন প্রয়োজন মত বের করে সমাধান হিসেবে পেশ করা যায়।

তাছাড়া বইটির আলোচনায় বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি, বরং কুরআনের সূরাগুলোর ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে বিভিন্ন আয়াতের বিষয়বস্তু বির্ধারণ করা হয়েছে। আলোচনার উৎসের উল্লেখ কোনো কোনো স্থানে অসতর্কতাবশত বাদ পড়ে গেছে। আবার কোথায়ও আলোচনা শেষ করে উৎসের উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাওবা আলোচনার সাথেই উৎসের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সার্বিকভাবেই এ বইতে যেসব তাফসীরের সাহায্য গ্রহণ করেছি, তাহলো ঃ

১. আল কুরআনুল করীম—ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।
২. কুরআনুল হাকীম—শাহ রফি উদ্দীন (র) ও শাহ আশরাফ আলী থানভী (র)
৩. মা'আরেফুল কুরআন—মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)
৪. তাফসীরে ইবনে কাসীর—আল্লামা ইবনে কাসীর (র)
৫. তাফহীমুল কুরআন—সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
৬. বায়ানুল কুরআন—শাহ আশরাফ আলী থানভী (র)
৭. তাফসীরে মাজেদী—আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী।

৮. তাফসীরে মাযহারী—কাযী ছানা উল্লাহ পানীপথী (র)

৯. মিশকাত শরীফ—শেখ অলি উদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)

১০. তাদাব্বুরে কুরআন—মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী (র)

১১. তাফসীরে হাক্কানী—মাওলানা আবদুল হক (র)

১২. আল কুরআনুল কারীম—মাওলানা মাহমুদুল.হাসান (র) ও মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী (র)

১৩. চল্লিশ হাদীসে কুদসী—ড. ইয্যুদ্দীন ইবরাহীম (র)

বিষয়বস্তু নির্ধারণে যেসব শিরোনামের উল্লেখ করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট আয়াতের মর্মার্থ বিভিন্ন তাফসীর থেকে যেভাবে বুঝতে পেরেছি সেভাবেই উল্লেখ করেছি। এ ব্যাপারে সহৃদয় পাঠকমণ্ডলীর মন্তব্য/পরামর্শ পেলে বইটির মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আশা রাখি। ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদনের পর সময় পেলে লেখার কাজে হাত দিতে হয়েছে বিধায় অনেক সময় অতিবাহিত হলেও লেখাব কাজ শেষ করতে পারিনি। এদিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় আগ্রহী ছাত্র ও শিক্ষকের তাগিদে ও অনুরোধে আপাততঃ যে পর্যন্ত লেখার কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা-ই প্রকাশের উদ্যোগ নিতে হয়েছে। এজন্যে সূরা আন নিসা পর্যন্ত লেখা শেষ করে একে বইয়ের প্রথম খণ্ড হিসেবে ছাপানোর ব্যবস্থা নেয়া হলো।

সময়ের স্বল্পতার কারণে বইয়ের শিরোনামের অধীনে সন্নিবেশিত কিছু কিছু আলোচনা অতি সংক্ষেপে পেশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে তা সম্প্রসারণের ও পূর্ণাঙ্গ রূপদানের আশা রইল। বইটি বহুমুখী বিভ্রান্তি ও ষড়যন্ত্রের শিকার আজকের নারী সমাজের প্রকৃত অবস্থান, সত্যিকার মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে সামান্য অবদান রাখতে পারলেও শ্রম সার্থক মনে করবো।

আধুনিক প্রকাশনী বইটি প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। বইটি প্রকাশের কাজে বিভিন্নভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন, প্রেরণা যুগিয়েছেন, ব্যবস্থা নিয়েছেন আল্লাহ সবাইকে নেক জাযা দিন।

—মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন

সূচীপত্র

সূরা আল বাকারা

সূরা আলে ইমরান

সূরা আন নিসা

এক

وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ○ (البقرة : ٢٥)

"জান্নাতবাসীদের জন্যে পূত-পবিত্র যুগল রয়েছে। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫)

জান্নাতে পুরুষরা পাবে পবিত্র নারী আর নারীরা পাবে নিষ্কলুষ নর

সৎকর্মশীল ঈমানদার লোকদের জন্যে নির্ধারিত স্থায়ী নিবাস হবে জান্নাত। তথায় অনুপম সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণাদির মধ্যে পবিত্র যুগল বা জোড়ও থাকবে।

আরবী ভাষায় اَزْوَاجٌ (আয্ওয়াজ) যওজ শব্দের বহুবচন। অর্থ যুগল বা জোড়। স্ত্রী ও স্বামী উভয়ের জন্যেই এ শব্দ সমভাবে প্রযোজ্য। স্বামীর যওজ স্ত্রী, আর স্ত্রীর যওজ স্বামী। এ অর্থে সৎকর্মশীল পুরুষ পাবে পবিত্র রমণী আর সৎকর্মশীলা রমণী পাবে নির্মল চরিত্রের স্বামী।

দুনিয়ার জীবনে যে ব্যক্তি সৎকর্মশীল ঈমানদার, কিন্তু তার স্ত্রী যদি হয় অসৎ চরিত্রের দুষ্কর্মশীলা। এ ধরনের দুনিয়ার যুগলের পরকালের জীবনে পূর্বের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। অতপর সৎকর্মশীল ঈমানদার লোকটিকে স্ত্রী হিসেবে অন্য কোনো সৎকর্মশীলা পূত-পবিত্র রমণী দেয়া হবে। আর যদি মহিলাটি হয় সৎকর্মশীলা আর স্বামী হয় চরিত্রহীন বেঈমান। তখন ঐ অসৎ স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকেও অন্য কোনো চরিত্রবান ঈমানদার স্বামী দেয়া হবে। অবশ্য কোনো দম্পতির উভয়ই যদি দুনিয়াতে নেককার হয়, তবে পরকালীন জীবনেও তাদের পূর্ব সম্পর্ক বহাল থাকবে। সর্বাবস্থায় তাদের এ সম্পর্ক হবে চিরস্থায়ী। দুনিয়ার জীবনের স্বামী-স্ত্রী বেহেশতেও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বহাল থাকবে। তাদের সম্পর্ক অটুট থাকবে।-(তাফহীমুল কুরআন)

কুরআন শরীফের অনেক মুফাস্সির উপরোক্ত আয়াতের তরজমায় (اَزْوَاجٌ) আযওয়াজ শব্দের অর্থ করেছেন স্ত্রী, সংগিনী বা রমণী শব্দ দিয়ে। কারণ, আয়াতের মধ্যে 'হুম' শব্দ পুরুষ বাচক সর্বনাম। তাই তাদের জন্যে আযওয়াজ হবে রমণী বা স্ত্রী। কিন্তু 'হুম' শব্দ পুরুষ বাচক সর্বনাম হলেও এর মধ্যে জান্নাতবাসীনী নারীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে শুধু

পুরুষ বাচক সর্বনামের ব্যবহার কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পরিলক্ষিত হয়। যেমন كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (তোমাদের জন্যে রোযা ফরয করা হলো) এখানে 'কুম' শব্দ পুরুষ বাচক সর্বনাম হলেও তা মূলতঃ নর-নারী উভয়ের জন্যে প্রযোজ্য।

উপরোক্ত আয়াতে কারিমায় اَزْوَاجٌ (আযওয়াজ) শব্দের বিশেষণ নেয়া হয়েছে مُطَهَّرَةٌ (মোতাহ্হারাহ) শব্দ। সুতরাং اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ মানে পূত-পবিত্র যুগল বা জোড়া। আরবীতে পুংলিঙ্গ বাচক বহুবচন শব্দের صفت (বিশেষষণ) স্ত্রীলিঙ্গ বাচক একবচন শব্দ ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে। কাজেই مُطَهَّرَةٌ শব্দের কারণেও 'আয্ওয়ায' শব্দ দ্বারা কেবল স্ত্রী বুঝাবে না।

হাদীসে কুদ্সীতে আছে ঃ

عن ابى هريرة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى اعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر -(رواه البخارى، ومسلم والترمذى وابن ماجاه)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেছেন, "আমার নেক বান্দাদের জন্য আমি এমন অনেক কিছু রেখেছি, যা কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, আর না কোনো মানুষের অন্তরে সে বিষয়ে জাগ্রত হয়েছে।-(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, ইবনে মাযাহ)

কুরআন শরীফের উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় জান্নাতে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য মওজুদ থাকবে অসংখ্য নায-নিয়ামত ও বহু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সামগ্রী, আরও থাকবে পবিত্র জীবন সংগী—জান্নাতী পুরুষের জন্য সতী-সাধ্বী ও পবিত্র নারী—আর জান্নাতী নারীর জন্য সৎ পুরুষ।

জান্নাতের পবিত্র জীবন সংগিনী বা স্ত্রী হবে যাবতীয় বাহ্যিক ও গঠনগত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র, তাছাড়া পেশাব-পায়খানা রজস্রাব ইত্যাদি ঘৃণ্য বস্তুর উর্ধে। তেমনি নীতি ভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা, অবাধ্যতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও কদর্যতা–প্রভৃতির লেশমাত্রও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না।
–(মাআরেফুল কুরআন)

জান্নাতে নর-নারীর পূত-পবিত্রতা বলতে বুঝায় গঠনগত ত্রুটি বিচ্যুতি ও চারিত্রিক কলুষতা মুক্ত হওয়া। তারা পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি ঘৃণ্য বস্তু থেকে

পবিত্র ও নিষ্কলুষ থাকবে। অনুরূপভাবে নীতি ভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা ও আবাধ্যতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি এবং কদর্যতা থেকেও পবিত্র পরিচ্ছন্ন এমনকি নারীদের রজস্রাব থেকেও তারা মুক্ত থাকবে। অনুরূপভাবে নীতি ভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা, অবাধ্যতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও কদর্যতার লেশমাত্রও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ তারা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন দোষ তথা দৈহিক ও মানসিক যাবতীয় পংকিলতা, অপবিত্রতা ও নিকৃষ্টতা থেকে থাকবে সম্পূর্ণ পবিত্র ও স্বচ্ছ।

কুরআন ও হাদীসে জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সামগ্রীকে মানুষের বুঝার জন্যে দুনিয়ার কোনো আরামদায়ক সুখ সামগ্রীর সাথে তুলনা করা হলেও তার অর্থ জান্নাত ও দুনিয়ার বস্তুর সামঞ্জস্যতা বর্ণনা করা নয়। বরং মানুষের জানাশুনা বস্তুর নিরিখে তা অনুধাবন করানোই উদ্দেশ্য। বস্তুত জান্নাতের কোনো নিয়ামতের নজীর দুনিয়ার কোথায়ও নেই। পৃথিবীর কোনো চোখ জান্নাতের নিয়ামত দেখেনি, কোনো কান সে ব্যাপারে শোনেনি, আর কোনো মানুষের অন্তরে তার ধারণারও উদ্রেক হয়নি।–(হাদীসে কুদ্সী)

উৎস ঃ ১। আল-কুরআনুল করীম–ইসলামিক ফাউণ্ডেশন

২. মায়ারেফুল কুরআন–মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র)

৩. কুরআনুল হাকীম–শাহ রফিউদ্দীন (র) ও আশরাফ আলী থানবী (র)

৪. বায়ানুল কুরআন–আশরাফ আলী থানবী (র)

৫. তাফহীমুল কুরআন–সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

দুই

وَقُلْنَا يَآادَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ص
وَلاَ تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ۝(البقرة : ٣٥)

"আমি আদমকে বললাম, হে আদম ! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক। আর সেখান থেকে যা-ই ইচ্ছা, পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তি সহকারে খেতে থাক। কিন্তু এ গাছটির ধারেও যেয়ো না। অন্যথা তোমরা যালেমদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৩৫)

নরের জীবন যাপনে নারীর আবশ্যকতা

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন মাটি থেকে। অতপর তারই সংগিনী স্ত্রী হিসেবে তার দেহাংশ থেকে তৈরী করলেন বিবি হাওয়া (আ)-কে এবং তাদের নির্দেশ দিলেন, জান্নাতে বসবাস করতে। এখানে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি আদমকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস করতে থাক। জান্নাতের হাজারো রকমের নায-নেয়ামত ভোগ করার জন্যে আদমকে বলা হলো। কিন্তু এতসব নিয়ামতের মধ্যেও তাঁর সামগ্রিক প্রশান্তি ও পরিপূর্ণ তৃপ্তির জন্যে তাঁকে সস্ত্রীক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথাৎ আল্লাহ মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, স্ত্রী ছাড়া একজন পুরুষের জীবন যাপন অপূর্ণ থেকে যায়। তাই পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ)-কে তৈরী করার পর পূর্ণাঙ্গ জীবন-যাপনের জন্যে সংগিনী (স্ত্রী) হিসাবে সৃষ্টি করলেন হযরত হাওয়া (আ)-কে। পূর্বের আয়াতের মত এখানেও হযরত হাওয়া (আ)-কে আদম (আ)-এর যওজ রূপে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

দুনিয়াতে মানব জাতিকে নর ও নারী রূপে সৃষ্টি করার পেছনে মহান আল্লাহর বিশেষ সুকৌশল ও সুনিপুনতা বিরাজিত রয়েছে। যেমন সূরা আর রূমে ২১নং আয়াতে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْآ اِلَيْهَا -

অর্থাৎ "তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এও একটি যে, তিনি তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জোড় সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাদের কাছে পরম প্রশান্তি লাভ করতে পার।" রাব্বুল আলামীন এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, নর নিজ প্রকৃতির দাবী পূরণ করতে পারে নারীর কাছে, আর নারী তার প্রকৃতির দাবী পূরণ করে নরের কাছে। উভয়ই পরস্পরের সাথে সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকবে আর একে অপরের কাছে লাভ করবে পরম শান্তি, তৃপ্তি, স্বস্তি ও আশ্বস্তি। এতে করে আল্লাহ্ তা'আলা একদিকে যেমন মানব বংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, অপর দিকে তেমনি মানবীয় সভ্যতা ও তমদ্দুন সৃষ্টির মাধ্যমও বানিয়েছেন।

আল্লাহ মানুষকে পুরুষ ও স্ত্রী দুটো লিংগে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। এদের দেহ গঠনের মৌল ফর্মূলা একই রকম। তবুও তারা পরস্পর হতে ভিন্ন ধরনের দৈহিক গঠন, মানসিকতা, আবেগ ও ভাবধারা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে। তারা সবাই পরস্পরের জন্যে পরিপূরক জুড়ি। সমস্ত পশু প্রজাতির মোকাবিলায় মানব জাতির মধ্যে সভ্যতা ও তমদ্দুন সৃষ্টির এটাই মূল কারণ যে, আল্লাহ এ নর-নারীকে পরস্পরের প্রতি এমন বাসনা-কামনা ও ব্যগ্রতা-ব্যাকুলতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, একজন আরেক জনের সাথে মিলিত ও সংযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউই প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। এ প্রশান্তি প্রাপ্তি ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা ও ভূমিকা উভয়েরই সমান। সুতরাং সভ্য জীবন-যাপনে নরের জন্যে যেমন নারী আবশ্যক, ঠিক তেমনিভাবে নারীর জন্যে আবশ্যক নরের।

মানব সৃষ্টির গোড়াতেই আল্লাহ্ তা'আলা নর-নারীকে পরস্পরের সান্নিধ্যে প্রশান্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন। জান্নাতে তাদের সামষ্টিক বাসস্থান নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট গাছের ফল ছাড়া যে কোনো স্থানের যে কোনো খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দিয়ে দিলেন তাদের। উপরোক্ত আয়াতে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আল্লাহ বসবাসের ব্যাপারে বলেছেন, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। কিন্তু পরবর্তীতে খাদ্য ও অন্যান্য নির্দেশাদি পালনে বলেছেন তোমরা দু'জনে যা ইচ্ছা খেতে পারো ; কিন্তু দু'জন এ গাছের ধারেও যাবে না। অর্থাৎ তোমাদের অবস্থানের দিক থেকে স্বাতন্ত্র থাকবে ঠিক কিন্তু তোমরা জীবন-যাপনে পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক হয়ে থাকবে।

এ পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে মানব সমাজ ও মানব সভ্যতার ভিত্ রচনা করেছিলেন। এখান থেকেই পরিবার ও পারিবারিক জীবনের সূচনা। পরিবার গঠন ও পারিবারিক জীবন-যাপন করা

মানব জীবনের জন্য যেমন অত্যাবশ্যকীয়, তেমনি তা একটি উত্তম সমাজের জন্যও অপরিহার্য ভিত্তি স্বরূপ। পরিবারকে বাদ দিয়ে মানবতার বিকাশ ও মানবীয় চরিত্র অর্জন ও সংরক্ষণ–কিছুতেই সম্ভব নয়।

সূত্র ঃ ১. তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন ঃ মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র)

২. তাফসীরে ইবনে কাছির ঃ আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

তিন

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝(البقرة : ٤٩)

"স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমি ফেরাউনী সম্প্রদায় থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের মর্মান্তিক যাতনায় ডুবিয়ে রাখতো। তারা তোমাদের পুত্রদের যবাই করতো আর কন্যাদের জীবিত রাখতো। বস্তুত এটা ছিল তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক কঠিন পরীক্ষা।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৪৯)

নরকে খতম করে নারীকে জীবিত রাখার মানব ইতিহাসের এক জঘন্যতম অধ্যায়

হযরত মূসা (আ)-এর সময়কার মিসরের দ্বিতীয় ফিরাউন বাদশাহর আমলের ঘটনা। একদা ফেরাউন স্বপ্নে দেখল যে, বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে একটা অগ্নিপিণ্ড মিসরের ফিরাউন বংশীয় কিব্‌তি লোকদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করলো। ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় সে জানতে পারলো যে, বনী ইসরাঈল গোত্রের একটা লোকের হাতে তার রাজত্ব খতম হয়ে যাবে। আল্লামা ইবনে কাসির এভাবে বর্ণনা করেছেন। মুফতি শফি (র)-এর মতে কেউ তাকে একথার ভবিষ্যদ্বাণী করে ছিল। যাই হোক, এ স্বপ্ন বা ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে ফিরাউন তার রাজ্যের নবজাত পুত্র সন্তানদের হত্যা করতো আর কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখতো। আল-কুরআনে ফিরাউনের এ আচরণকে বনী ইসরাঈলদের জন্য জঘন্যতম বিপদ ও পরীক্ষা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে ইসরাঈলীদের জন্যে এটা মহাবিপদ ও পরীক্ষা ছিল। এক. ফিরাউনী বংশের হাতে তাদের বংশের ধ্বংস হওয়া এবং তাদের ভবিষ্যত বংশ বিস্তার খতম হয়ে যাওয়া। এভাবে ইতিহাসে তাদের নাম-নিশানা শেষ হয়ে যাওয়া। দুই. তাদের পুত্র সন্তানদের তাদেরই সামনে প্রকাশ্যে হত্যা করার কঠিন মর্মপীড়া। তিন. নর-নারীর প্রজন্মের ভারসাম্য লোপ পেয়ে মানবীয় পরিবেশ ক্ষতবিক্ষত হওয়া। চার. পুরুষরা পরিবারের কর্তা। জন্মগতভাবে পুরুষদের উপার্জন করার ও কঠোর জীবন পরিচালনার যোগ্য করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

পুত্র সন্তানগণকে হত্যা করার পরিণামে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ অংশকে ধ্বংস করা হতো। এটাও ইসরাঈলীদের জন্য কঠিন অগ্নি পরীক্ষা ছিল।

মূসা (আ)-এর যুগে তৎকালীন ফিরাউন তার রাজত্ব ও ক্ষমতা ঠিক রাখার জন্য মানব হত্যার এ জঘন্যতম পন্থা অবলম্বন করেছিল। মানবেতিহাসের এ হচ্ছে এক অমানবিক ও নির্মম অধ্যায়। নারীদের জন্য পুরুষ হচ্ছে জীবন-যাপনের অপরিহার্য স্বাভাবিক উপাদান স্বরূপ। নারী-পুরুষ পরস্পরের জন্য পরিপূরক হলেও উভয়ের গঠন-প্রকৃতি আর আজকের সামাজিক পরিবেশের নিরিখে নারীর জন্য বরং নর অধিক কাম্য। অথচ ফিরাউন তার তখ্‌ত ঠিক রাখার জন্য সমাজের প্রধান সদস্য নরকে হত্যা করে নারীকে ছেড়ে দিত। ফলে নারীর জীবন এক ভয়াবহ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে পড়তো। এ ছিল নারীদের জন্য এক অসহনীয় যন্ত্রণা ও স্বাভাবিক জীবন-যাপনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা। এ যন্ত্রণা ও যুলুমকে আল্লাহ্ তা'আলা سُوْءَ الْعَذَابِ (মর্মান্তিক যাতনা) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর অনুসারীদের ফিরাউনের সেই কঠোর শাস্তি থেকে উদ্ধারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'আলা শেষ পর্যন্ত ফিরাউনকে নীল নদে নিমজ্জিত করে মূসা (আ)-এর সাথে বনী ইসরাঈলীদের নাজাত দিয়েছিলেন।

চার

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَائِيْلَ لَاتَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط(البقرة : ٨٣)

"স্মরণ করো, যখন ইসরাঈল সন্তানদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না, আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে ; আর ইয়াতীম ও মিসকীনের সাথেও। তাছাড়া মানুষের সাথে ভাল কথা বলবে। নামায কায়েম করবে ও যাকাত দিবে।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ৮৩)

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও সকল মানুষের সাথে সদাচারের নির্দেশ পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও বিদ্যমান ছিল

উপরোক্ত আয়াতে প্রতীয়মান হয় যে, তাওহীদ পন্থী হওয়া, মাতা ও পিতার সেবাযত্ন করা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, বালক-বালিকা ও দীন দরিদ্রের সাথে সদ্ব্যবহার করা, সকল মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার করা এবং নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বের শরীয়তসমূহেরও নির্দেশ ছিল। এখানে এসব বিষয়ে বনী ইসরাঈলের সাথে তাওরাতে এ অঙ্গীকারও পাকা-পোকত ওয়াদা নেয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল কুরআনের বহু স্থানে মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ মেনে নেয়ার নির্দেশের পর পরই নিজের মাতা ও পিতার সেবাযত্ন করার প্রতি তাগিদ দেয়া হয়েছে। বরং বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ সরাসরি তাওহীদের পরেই মাতা ও পিতার প্রতি ইহসান করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط ـ

"তোমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করো না, আর মাতা-পিতার সাথে ইহসান বা সদাচার করো।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩)

সূরা লোকমানে বলেছেন ঃ

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ط -(لقمان : ١٤)

"তুমি আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"

এভাবে সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীন নারীকেও অর্থাৎ মাতাকেও পিতার সাথে মর্যাদা দিয়ে নর-নারী সবাইকে নিজ নিজ মাতা ও পিতার খিদমত ও শোকর আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ নির্দেশ হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকৃতির সাথে সাথে মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য পালন করার।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক বাণীতে পিতার তুলনায় মাতা অর্থাৎ নারী জাতির সেবা শুশ্রূষার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একদা জনৈক সাহাবী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি কার প্রতি সদাচার প্রদর্শন করবো ? তিনি বললেন, তোমার মায়ের প্রতি। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর ? তিনি বললেন, তোমার মায়ের প্রতি। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর ? তিনি এবারও জবাব দিলেন তোমার মায়ের প্রতি। ৪র্থবার জিজ্ঞাসিত হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, "তোমার পিতার প্রতি।" অন্য হাদীসে কিছু সংযোজন করা হয়েছে যে, অতপর তোমার রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়ের প্রতি।

হযরত আদম (আ) তথা পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী থেকে শুরু হয় মানব জাতির প্রতি আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও বিধানাবলীর নির্দেশনা। মানব জাতির প্রতি আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশে নিহিত রয়েছে মানুষের কল্যাণ আর প্রতিটি নিষেধের মধ্যে তাদের ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ। তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস ও আমল মানুষের স্বার্থেই আবশ্যকীয়। মাতা-পিতা হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের বংশের সিল্‌সিলা জারী থাকার একমাত্র কার্যকর মাধ্যম। এজন্যে তাওহীদী আকীদার পাশাপাশি মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য রাব্বুল আলামীন নির্দেশ দিয়েছেন। আবার মৌলিক ইবাদাতের পাশাপাশি মানুষের সাথে সদাচার তথা আল্লাহর মাখলুকাতের হক আদায় করাও কর্তব্য। ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় স্বজন—সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করার, সকল মানুষের সাথে ভাল কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা।

মানবেতিহাসের সকল অধ্যায়েও নবী রাসূলগণের যুগে আল্লাহর মৌলিক বিধান অপরিবর্তনীয়। সকল যুগের মানুষের জন্যই কল্যাণ ও অকল্যাণের মৌলিক আমল অভিন্ন। বরং ইবাদাতের মৌল কাঠামোতে সংযোজন এবং পরিবর্তন হলেও তাওহীদী আকীদা, মাতা-পিতার প্রতি সদাচার, মানুষ তথা সকল সৃষ্টিকে ভালবাসার নির্দেশ রয়েছে অপরিবর্তনীয়। কারণ, এযে মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন।

সূত্র ঃ ১. কুরআনুল কারীম ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন

২. কুরআনুল হাকীম ঃ শাহ্ রফিউদ্দীন (র) ও আশরাফ আলী থানবী (র)

৩. মাআরেফুল কুরআন–মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

৫. তাফসীরে ইবনে কাসির–আল্লামা ইবনে কাসির (র)

পাঁচ

فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَايُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ـ (البقرة : ١٠٢)

"তারা (ফেরেশতাদের কাছে) এমন তদবীর শিখতো যাতে তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতো।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১০২)

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি জঘন্যতম কাজ

হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালামের যুগের একটি ঘটনা এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। তখন লোকদের নিকট অধিকতর চাহিদার বিষয় ছিল তাবিজ-তুমার বা যাদুর প্রভাবে অন্যের স্ত্রীকে তার থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা। হারূত ও মারূত নামের দু'জন ফেরেশতাকে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষার জন্যে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তারা পরীক্ষায় টিকতে পারেনি। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই ঃ

একদা কতিপয় ফেরেশতা মানব জাতির আমল নিয়ে সমালোচনা করে আল্লাহকে বললো, যেই মানব জাতিকে তোমার ইবাদাতের জন্যে সৃষ্টি করেছ, তারাই তো তোমার নাফরমানীতে লিপ্ত। আল্লাহ্ বললেন, মানুষ আমাকে দেখছে না বিধায় এমনটি করছে। কোনো কোনো বর্ণনা মতে ফেরেশতাদের অভিযোগ ছিল মানুষ দুনিয়াতে ন্যায় বিচার করে না। আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ফেরেশতাকে আন। অধিক সদাচারী দু'জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতকে নফসের খাহেশ দিয়ে পরীক্ষার জন্যে দুনিয়াতে পাঠানো হলো। জোহরা নাম্নী একটি অতি সুন্দরী মহিলাকে দেখে তারা ঠিক থাকতে পারলো না। কোনো কোনো বর্ণনা মতে মহিলাটি হযরত হারূত ও মারূতের আদালতে তার স্বামীর বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা নিয়ে এসেছিল। অবশেষে হত্যা করা, শরাব পান করা ও মূর্তিপূজা করার মধ্যে যে কোনো একটি শর্ত পূরণ করলে ঐ মহিলা ফেরেশতাদ্বয়কে তাদের বাসনা পূরণ করতে দেবে বলে সম্মতি জানালো। কিন্তু আল্লাহ্ তো তাদের পাঠানোর সময় ঐসব কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রবৃত্তির ওয়াস্ওয়াসায় তারা শরাব পান করাকে অপেক্ষাকৃত কম জঘন্য মনে করে শরাব পান করলো। অতপর যেই একজন ফেরেশতা তার বাসনা পূরণে উদ্যত হলো তখনি মহিলাটি বললো, আচ্ছা তোমরা কি পড়ে আকাশে উঠে

যাও তা আমাকে বলো। তবে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবো। তারা তাকে ওটা শিক্ষা দিল। মহিলাটি তা পড়ে আকাশে উঠে গেল। সেখানে সে অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হয়ে স্থবীর হয়ে গেল। আজকেও জোহরা সেতারা নামে মানুষ তাকে জানে। তাফসীরকারকদের এ ঘটনাকে অনেক মুহাক্কিক আলেম ইসরাঈলী রেওয়ায়াতের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী তাঁর তাফসীরে বলেছেন ঃ যে এ ঘটনাটি কোনো নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত নয়। ইবনে কাসীরের উদ্ধৃত এ ঘটনাকে তিনি আয়াতের ব্যাখ্যার ভিত্তি নয় বলে উল্লেখ করেছেন।

উপরোক্ত আয়াতে তখনকার মানুষ যে ঐ দু'জন ফেরেশতা থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর তদবীর বা যাদু শিখতো ; তাদের নৈতিক অধঃপতনের সেই জঘন্যতম অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। ফেরেশতাদ্বয় মানুষকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করে দিতো যে, আমরা তো পরীক্ষার জন্যে এসেছি। সুতরাং তোমরা এসব করে—নিজের পরকাল ধ্বংস করো না। এতদসত্ত্বেও মানুষ তাদের কাছ থেকে তাবীজ-তুমার বা আমালিয়াত গ্রহণের জন্যে পাগল হয়ে গেল।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) তাঁর "তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে" হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর বায়ানুল কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এক সময়ে বাবেল শহরে যাদু বিদ্যার খুব প্রচলন ছিল। যাদুর অত্যাশ্চার্য ক্রিয়া দেখে মূর্খ লোকদের মধ্যে যাদু ও মোজেযার মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। কেউ কেউ যাদুকরদের সজ্জন ও অনুসরণ যোগ্য মনে করতে থাকে, আবার কেউ কেউ যাদুকে পূন্য কাজ মনে করে তা শিখতে ও আমল করতে থাকে। যেমন আজকাল মেস্‌মারিজমের বেলায়ও তাই হচ্ছে। এ বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুজন ফেরেশতা পাঠান। তাদের দায়িত্ব ছিল যাদুর স্বরূপ ও ভেল্কিবাজী সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা—যাতে বিভ্রান্তি দূর হয় এবং মানুষ যাদুর আমল ও যাদুকরদের থেকে দূরে থাকে। নবীদের নবুওয়াতের জন্য যেমন মুজেযা দেয়া হয় তেমনি হারূত ও মারূতের ফেরেশতা হওয়ার প্রমাণ সহ তাদের পাঠানো হলো।

ফেরেশতাদ্বয় বাবেল শহরে তাদের কাজ শুরু করে দিলেন। তারা যাদুর মূল ও শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করে জনগণকে এ কু-কর্ম থেকে বিরত থাকার ও যাদুকরদের ঘৃণা করার উপদেশ দিলেন। এ সময় বিভিন্ন লোক বিভিন্ন সময়ে ফেরেশতাদের কাছে আসা-যাওয়া করতে থাকে। পরে এসব যাতায়াতকারীগণ অনুরোধ করতে থাকে যে, তাদেরকেও যাদুর মূল ও শাখা-প্রশাখা শিখিয়ে

দেয়া হোক যেন তারা অজ্ঞতাবশতঃ এতে বিশ্বাসী না হয়ে পড়ে অথবা কোনো অপকর্মে লিপ্ত হয়ে না পড়ে। ফেরেশতাগণ তাদের অনুরোধ রক্ষা করে যাদু শিখিয়ে তাদের সাবধান করে দিতো, "দেখ ! আমাদের উপদেশ এই যে, তোমরা যেন যাদু বিদ্যা শিখেও সুনিয়্যাতের উপর কায়েম থাক। এমন যেন না হয় যে আত্মরক্ষার অজুহাতে আমাদের থেকে যাদু শিখে নিজেই অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড় ! আর দ্বীন ও ঈমান বরবাদ করে বসো।

এভাবে যারা ওয়াদা অঙ্গীকার করতো তাদের যাদুর মূল ও শাখা-প্রশাখা বলে দেয়া হতো। অতপর কেউ কেউ ওয়াদা ভংগ করে সৃষ্টজীবের অনিষ্ট করতো। এটা নিশ্চিতরূপেই একটি দুষ্কর্ম ছিল।

দাম্পত্য সম্পর্ক মানব সভ্যতার ভিত্তি স্বরূপ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুষ্ঠু ও সঠিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার উপরই গোটা মানব সমাজের সুষ্ঠুতা একান্তভাবে নির্ভর করে। অন্যথা পুরো সমাজটিই চূর্ণবিচূর্ণ হতে বাধ্য। হাদীস শরীফে আছে, ইবলীস তার কর্মকেন্দ্র থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তার এজেন্ট প্রেরণ করে। তারা ফিরে এসে নিজ নিজ রিপোর্ট পেশ করে থাকে। কেউ বলে আমি অমুক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছি, কেউ বলে আমি অমুক অশান্তি ঘটিয়েছি, কেউ বলে আমি অমুক পাপাচার সংঘটিত করেছি। কিন্তু তাদেরই রিপোর্টের জবাবে ইবলীস মন্তব্য করে যে, তোমরা কিছুই তো করনি। অবশেষে একটা এজেন্ট এসে বলে আমি একটি দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছি। একথা শুনে ইবলীস তার সাথে আলিংগন করে বলে, "তুমিই তো একটা কাজের মত কাজ করেছ।"

মানুষের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান মানব জীবন, মানব পরিবার ও মানব সভ্যতার ভিত্ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট করতে পারলেই খুশী হয়। আর এ সম্পর্ক স্থাপিত হয় বিবাহের পবিত্র বন্ধন দিয়ে। আজকের সমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে পর্যালোচনা করলে ঐ সময়ের শয়তানের চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য দেখা যায়। সে যুগের লোকদের নৈতিক ও চারিত্রিক অধপতনের গভীরতা যেমন উক্ত অবস্থা থেকে জানা যায়, তেমনি তার সাথে তুলনা করে বর্তমান সমাজকেও মূল্যায়ন করা সহজ হয়। আমাদের সমাজের প্রত্যেক আনাচে-কানাচে আজকে যেন হযরত সোলায়মান (আ)-এর যুগের লোকদের চারিত্রিক অধঃপতনের চূড়ান্ত রূপায়ণ ঘটছে। কথায় কথায় তাবীয-তুমার ও যাদু-বিছট করে সামাজিক অশান্তি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। তাবীয করে অন্যের স্ত্রীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা, অন্যের কন্যাকে অবৈধভাবে নিয়ে যাওয়া আজকের নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। আর সে পথ সহজ

করে দিয়েছে বেপর্দায় মহিলাদের চলাফেরা, তাদের বেপরোয়া যত্রতত্র বিচরণ, সহশিক্ষার প্রচলন ও সিনেমা টি. ভি.র অশ্লীল ছবি প্রদর্শন। একশ্রেণীর বিকৃতমনা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতা ঘেরা অজ্ঞতা আমাদের সমাজের এহেন বিরূপ পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক ও লালনকারীর ভূমিকায় তৎপর থাকায় এ অধপতিত সমাজের বিশুদ্ধতা লাভের সম্ভাবনার বিলুপ্তি ঘটেছে।

আজকের সমাজে মানুষ যে কোনো হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে তারই মত আরেকজন লোককে যথাযথ কারণ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত এমনকি হত্যা পর্যন্ত করে বসে। আর গ্রামে-গঞ্জে পর্যন্ত খনার-খলীফা দিয়ে তাবীজ-তুমার করে মানুষের ক্ষতি করতে এমনকি জানে শেষ করে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না। সামান্য স্বার্থ হাসিলের জন্যও মানুষ মানুষকে প্রতারিত করতে এমনকি জীবনে শেষ করে দিতে এতটুকুও ইতঃস্তত করে না।–(তাফসীরে ইবনে কাসীর ও মা'আরেফুল কুরআন)

ছয়

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ط اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ط (البقرة : ١٧٨)

"(হে যারা ঈমান এনেছ) তোমাদের জন্যে নর হত্যার কিসাস গ্রহণ সম্পর্কিত বিধান দেয়া হলো। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৮)

নারী হত্যাকারী যেই হোক না কেন, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

স্বাধীন ব্যক্তির হত্যাকারী কোনো স্বাধীন ব্যক্তি হলে যেমন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, তেমনি কোনো ক্রীতদাস বা কোনো নারী হত্যার বদলেও হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। স্ত্রী হত্যার অপরাধে পুরুষকে এবং পুরুষ হত্যার অপরাধে স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। কোনো প্রভাবশালী ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে যেমন, কোনো একজন প্রভাবশালী পুরুষ লোকের কিসাস স্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, তেমনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে একজন অসহায় নারী হত্যার কিসাসেও।

ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে একজন নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ডকে যথেষ্ট মনে করা হতো না, বরং তারা প্রতিপক্ষের বহুলোককে হত্যা করা ছাড়া তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা অবদমিত হতো না তেমন দাস বা নারী হত্যার কিসাসে তারা স্বাধীন পুরুষদের বহু লোককে হত্যা করার আগে শান্ত হতো না।

উপরোক্ত আয়াতে যে স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাসের এবং নারীর বদলে নারীর মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে, তা ছিল জাহেলী যুগের এক বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ইসলাম পূর্ব আরব গোত্রের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। এতে স্বাধীন পুরুষ, নারী ও কৃতদাসের বহু লোক নিহত হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্বেই ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, আর তারা উভয় গোত্রই ইসলাম

গ্রহণ করে। ইমলাম গ্রহণের পর তাদের মধ্যে কিসাস সম্পর্কে কথাবার্তা চলছিল। তাদের প্রবল গোত্রটি দাবী করে বলে যে, তাদের প্রত্যেক নিহত পুরুষ, নারী ও কৃতদাসের পরিবর্তে অপর গোত্রের, এক একজন স্বাধীন লোককে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা কোনো মীমাংসায় পৌঁছবে না। তাদের এহেন জাহেলিয়া সুলভ দাবীর জবাবে উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। যাতে তাদের মীমাংসার জন্যে কিসাস স্বরূপ স্বাধীন পুরুষের বদলে স্বাধীন পুরুষ, নারীর বদলে নারী, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাসকে মৃতদণ্ড দেয়ার বিধান দেয়া হয়েছে। ইসলামে হত্যাকারীকেই হত্যার বদলে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ইনসাফ ভিত্তিক বিধান জারী করা হয়েছে।

হত্যা জঘন্য অপরাধ। একটি জীবন, চাই তা স্বাধীন ব্যক্তির হোক, অথবা গোলামের জীবন হোক ; চাই তা পুরুষের হোক, অথবা হোক কোনো নারীর। হত্যার পরিবর্তে হত্যাই হলো ইনসাফপূর্ণ কাজ আর তা ভবিষ্যতের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারাণ্টিও বটে। অপরাধের বিচার যথার্থ ও ইনসাফপূর্ণ না হলে সে সমাজে মানব জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তার সম্ভাবনা থাকে না। রাব্বুল আলামীন তাই সামাজিক অনাচারের মূলোৎপাটনের ব্যবস্থাই করেছেন এ আয়াতের নির্দেশে।

'قصاص' (কিসাস)-এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অর্থাৎ কারো উপর যতটুকু যুলুম করা হয়েছে তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা মাযলুমের জন্য জায়েয। তার চাইতে বেশী করা জায়েয নয়। এ সূরার ১৯৪ আয়াতে এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ অর্থাৎ "তার উপর ততটুকু বাড়াবাড়ী কর যতটুকু বাড়াবাড়ী সে তোমাদের উপর করেছে।" তেমনিভাবে সূরা নহলের ১২৬ আয়াতে রয়েছে وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ "আর যদি তোমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে চাও তবে ততটুকু প্রতিশোধ নাও, তারা তোমাদেরকে যতটুকু কষ্ট দিয়েছে।"

হত্যার অপরাধে যেমন স্বাধীন ব্যক্তির হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃতুদণ্ড দেয়া হবে, তেমনি কোনো ক্রীতদাসের বেলায়ও কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃতুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। ঠিক তেমনিভাবে নারী হত্যার অপরাধে পুরুষকে এবং পুরুষ হত্যার অপরাধে স্ত্রী লোককেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে স্বাধীন ব্যক্তির বদলায় স্বাধীন ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকের বদলায় স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তা কেবল একটা বিশেষ

ঘটনার প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে যে, বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছিল।

আয়াতের মর্মার্থ এটাই সাব্যস্ত হয় যে, যে ব্যক্তি হত্যা করেছে কেবল সেই ব্যক্তিই কিসাসে দণ্ডিত হবে। সুতরাং কোনো নারীকে যদি কোনো পুরুষ হত্যা করে থাকে তবে ঐ নারীর কিসাসে তার হত্যাকারী সেই পুরুষকেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।-(মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন)

সাত

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ (البقرة : ١٨٧)

"সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্যে স্ত্রী সহবাস হালাল করা হলো। তারা তোমাদের জন্যে পোশাক আর তোমরাও তাদের জন্যে পোশাক। আল্লাহর জানা আছে যে, তোমরা নিজেদের সাথে নিজেরাই খিয়ানত করেছ। তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন ও তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তোমরা স্ত্রী সহবাস কর আর তোমাদের জন্যে আল্লাহ যা হালাল করে দিয়েছেন তা সন্ধান কর।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭)

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পোশাক স্বরূপ

আলোচ্য আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা, নৈকট্য ও অবিচ্ছেদ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দেহ ও পোশাক যেমন পরস্পরের একান্ত ঘনিষ্ট অবিচ্ছেদ, স্বামী-স্ত্রীও তেমনি একে অপরের জন্যে একান্ত আপনজন। পোশাক যেমন দেহকে হেফাজত করে ও তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, স্বামী-স্ত্রীও তেমনি পরস্পরকে সংরক্ষণ ও পরস্পরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। পোশাক যেমন শীত ও গরমের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কও মানুষকে পদস্খলন ও জীবনের দুঃখ-দুর্দশা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। সমস্যাটি তৎকালীন সাহাবায়ে কিরামের সিয়াম পালন ব্যাপদেশে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছিল। তখন ইফতার গ্রহণের পর থেকে নিদ্রা গমন পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস জায়েয ছিল। কিন্তু নিদ্রাগমনের পর রাত্রি থাকা সত্ত্বেও কেউ পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করতে পারতো না। আল্লামা ইবনে কাসীরের মতে ইসলামের প্রথম দিকে তা ছিল নিষিদ্ধ। এ আয়াতে তা হালাল করা হয়েছে। কিন্তু তাফহীমুল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট নীতি বিধান ছিল না। তবুও মুসলমানরা এরূপ করাকে নাজায়েয বলেই মনে করতো। নাজায়েয অথবা মাকরূহ ধারণা থাকা সত্ত্বেও তারা স্ত্রী সহবাস করতেন। এতে তাঁদের মনে অপরাধী ভাব বিরাজ করতো। এ আয়াতে আল্লাহ

মু'মিনদের মনের সংকীর্ণতা পরিহার করে বিবেকের পূর্ণ আশ্বস্তি ও পবিত্রতার অনুভূতি সহ স্ত্রীগমন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র) তাঁর তাফসীরে ইবনে কাসীরে অনেকগুলো বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দেয়া গেল।

একদিন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! বিগত রাত্রে আমি আমার স্ত্রীর কাছে সেই অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলাম যা সাধারণত একজন পুরুষ তার স্ত্রীর কাছে করে থাকে। আমার স্ত্রী জানালো, সে ঘুমিয়েছিল। কিন্তু তার সে কথাকে আমি বাহানা মনে করে তার সাথে সহবাস করেছি। এ ঘটনার পর উপরোক্ত আয়াত ঃ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ নাযিল হয়।

ঘটনাটির আরেকটি দিক হলো হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা)-এর বর্ণনা। তিনি বলেন, পরদিন প্রত্যুষেই উমর ইবনে খাত্তাব (রা) রাসূলের খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর অবস্থা (উপরোক্ত ঘটনা) বর্ণনা করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ج فَالْئٰنَ

بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ص -(البقرة : ١٨٧)

"তোমরা যে নিজেদের ব্যাপারে খেয়ানত করেছিলে তা আল্লাহ্ জানেন। অতপর আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন, আর তোমাদের ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন থেকে তোমরা (সুবহে সাদেক পর্যন্ত) স্ত্রী সহবাস করতে পার।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭)

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ -

"স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য পোশাক আর তোমরাও তাদের জন্য পোশাক।"

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে যুবাইর প্রমুখ বলেন ঃ

هُنَّ سَكَنٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ سَكَنٌ لَهُنَّ -

"স্ত্রীগণ তোমাদের মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি স্বরূপ আর তোমরাও তাদের জন্যে শান্তি ও তৃপ্তি স্বরূপ।"

রবী ইবনে আনাস এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ هُنَّ لِحَافٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِحَافٌ لَّهُنَّ অর্থাৎ "তারা তোমাদের জন্যে লেপ স্বরূপ আর তোমরাও তাদের জন্যে লেপ স্বরূপ।"

এসব ব্যাখ্যার সারকথা হলো স্বামী-স্ত্রী উভয়কে এক সাথে অহরহ মিলে-মিশে থাকতে হয় এবং পরস্পরের সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে জীবন কাটাতে হয়। একই শয্যায় শয়ন করতে হয়। সুতরাং রমযানের রাতের বেলায় রোযা যেন তাদের জন্যে পীড়াদায়ক না হয়, সেজন্যে রযমানের রাতে স্ত্রীসহবাস হালাল করে দেয়া হয়েছে।

মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকেই স্বামী-স্ত্রী সহবাসকে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের স্বভাবগত ধর্মে পরিণত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যে কারণে প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে বিবি হাওয়া (আ)-কে তার জীবন সংগীনি (স্ত্রী) হিসাবে সৃষ্টি করে বেহেশতে শান্তিতে বসবাস করতে দিলেন। মানব বংশ রক্ষার জন্যে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ থেকে একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে দিয়ে সমাজ জীবনের ভিত্তি স্থাপিত করতেই ইসলামে বিবাহ নীতির প্রবর্তন করা হয়েছে। এটি হচ্ছে ফিতরাতের ধর্ম ইসলামের স্বাভাবিক পদ্ধতি।

আলোচ্য আয়াতে স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের জন্যে পোশাক ঘোষণা দিয়ে মানব স্বভাবের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়া হয়েছে। দু'জন পৃথক স্বত্ত্বা হলেও দু'জনই অবিচ্ছেদ্য হয়ে দুনিয়ার জীবন যাপন করে থাকে। স্ত্রীদের সে জন্যেই অর্ধাঙ্গীনী বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কিন্তু আজকের সমাজে মেকী ভালবাসার খপ্পরে পড়ে আল্লাহর ঘোষিত স্বামী-স্ত্রীর সেই অকপট মধুর সম্পর্ক আর বাকী নেই। অধিকন্তু আজকের সমাজে যৌতুকের প্রাধান্য এবং ঘোষিত ও অঘোষিত যৌতুক প্রথার দৌরাত্মে দাম্পত্য জীবনের সেই প্রাকৃতিক প্রেম-প্রীতি বিলীন প্রায়। শরীয়তী বিবাহের পরিবর্তে বাণিজ্যিক বিবাহ মুসলিম সমাজকেও আজ এক ভয়াবহ পর্যায়ে উপনীত করেছে। মুসলমানদের সচেতনতা ও খাঁটী শরয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া এ মারাত্মক পর্যায় অতিক্রম করা কি সম্ভব ?

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ ط -

"মসজিদে ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় তোমরা স্ত্রীসহবাস করো না।"

রমযানের রাতে খানা-পিনা ও স্ত্রীসহবাস ইত্যাদি হালাল করা হয়েছে, কিন্তু রমযানের শেষ ১০দিনে যে ই'তিকাফ এর বিধান রয়েছে সেই ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় রাত্রী বেলায়ও স্ত্রী সহবাস জায়েয নেই। এখানে খানা-পিনা ও স্ত্রীসহবাসের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ ই'তিকাফকারী ব্যক্তি রযমানের রাতের বেলায় পানাহার করতে পারবে ঠিকই তবে স্ত্রীসঙ্গম করতে পারবে না। এ হুকুম কেবল ই'তিকাফকারী রোযাদারের জন্য মাত্র, আর ই'তিকাফ ছাড়া রোযাদারদের জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। আয়াতটির শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا

"আর তোমরা স্ত্রীসহবাস করো না যখন তোমরা মসজিদসমূহে ই'তিকাফ অবস্থায় থাক। এসব হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা, সুতরাং তোমরা এসবের ধারেকাছেও যেও না।"

'اعتكاف' (ই'তিকাফ) শব্দের অর্থ 'কোনো স্থানে অবস্থান করা।' কুরআন-সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় কতগুলো বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলে।

'فى المسجد' মসজিদসমূহে (বহুবচন) বলে বুঝানো হয়েছে যে, এ ই'তিকাফ যে কোনো মসজিদে হতে পারে। অবশ্য মসজিদ বলতে যেসব মসজিদে নিয়মিত জামাআত হয়ে থাকে তাকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় নিজের মানবিক ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়া যায়, কিন্তু যৌন স্বাদ আস্বাদন করা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা একান্ত অপরিহার্য। রোযাদার ও ই'তিকাফকারীর জন্য এসব সীমারেখা বলে দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, এসব সীমারেখার ধারেও যেও না। অর্থাৎ যেখান থেকে গুনাহের সীমানা শুরু হচ্ছে ঠিক সেই শেষ প্রান্তের সীমানা লাইনে চলাফেরা করা বিপদজনক। সীমানা থেকে দূরে অবস্থান করাই নিরাপদ ব্যবস্থা। কারণ সীমানা বরাবর চলতে গেলে ভুলেও সীমানার ওপারে পা চলে যেতে পারে।

–(তাফহীমুল কুরআন)

আট

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

"তোমরা কোনো মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ করো না। মুশরিক নারী তোমাদের মুগ্ধ করলেও তার চেয়ে ঈমানদার দাসী অনেক উত্তম। তেমনি কোনো মুশরিক পুরুষ ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমাদের কন্যাদের তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করো না। মুশরিক পুরুষ তোমাদের মুগ্ধ করলেও তার চেয়ে বরং একজন ঈমানদার দাস অনেক ভাল। কারণ তারা (মুশরিকরা) আহ্বান করে জাহান্নামের দিকে আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি তাঁর বিধানসমূহ মানুষের জন্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন—যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২১)

বৈবাহিক সম্পর্ক কি কেবল যৌন সম্পর্ক ?

বৈবাহিক সম্পর্ক কেবল যৌন সম্পর্কই নয় বরং তা এক গভীর সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও তামাদ্দুনিক সম্পর্কও বটে।

আলোচ্য আয়াতে মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রীদের জন্যে মুশরিকদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা বা হওয়া হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আহলে কিতাবদের মুশরিকগণ সহ সর্ব প্রকার মুশরিকের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ঈমানদার ও মুশরিক স্বামী-স্ত্রীর প্রভাব পরস্পরের উপর পড়ে থাকে। সেই পরিবারে ঈমান ও কুফরীর একটা জগাখিচুড়ী জীবনধারা দাঁনা বেঁধে উঠতে পারে। এ জাতীয় জীবনধারা মুশরেকী বা কুফরী জীবন বিধানের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক নাও হতে পারে ; কিন্তু ইসলামী জীবন বিধানের চোখে তা কিছুতেই বরদাশত করার বিষয় নয়। দু'জনের মধ্যে যেই অধিকতর প্রভাবশালী হবে পরিবারের সদস্যগণের উপর তার প্রভাব পড়বে সর্বাধিক।

৩—

এতে পরবর্তী বংশধরদের জগাখিচুড়ী চরিত্রই প্রকাশ পেয়ে থাকবে। তাছাড়া দু'জন যদি চরমপন্থী হয় তাহলে দাম্পত্য জীবন কলহপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কোনো প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি কেবলমাত্র যৌন ভোগ-লালসা চরিতার্থ করার এমন একটি অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হতে দিতে পারে না। কোনো ঈমানদার ব্যক্তি যদি কখনো কোনো মুশরিকের প্রেমে পড়ে তখন তার ঈমান, তার বংশ-পরিবার এবং নিজের দ্বীন ও চরিত্র রক্ষার জন্যে ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ কুরবানী করাই তার কর্তব্য। কারণ তাদের সাথে এরূপ সম্পর্কের ফলে কুফর ও শিরকের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তীব্রভাবে।

মুশরিক মহিলা বা পুরুষ কোনো ঈমানদার পুরুষ বা মহিলার জন্যে উপযুক্ত বা বিবাহযোগ্য হতে পারে না—যতক্ষণ না সে ঈমান আনবে বা মুসলমান হবে। অমুসলিম নারী-পুরুষ যতই দৈহিক বা আর্থিক আকর্ষণ সম্পন্ন হোক না কেন, সে কখনো ঈমানদারদের দাম্পত্য সাথী হতে পারে না। কারণ স্বরূপ কুরআন ঘোষণা করেছে যে, তারা তো জাহান্নামের অগ্নির দিকেই আহ্বান করে থাকে। আর আল্লাহ্ আহ্বান করেন জান্নাতের দিকে। তাই আল্লাহ্ চান না যে, কোনো বান্দা-বান্দী অমুসলিম জীবনসাথীর সংস্পর্শে গিয়ে তার প্রেমে পড়ে তাকে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করে অথবা তার বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত পথে পরিচালিত করতে থাকে।

যৌন সম্পর্ক অনেকটা পাশবিক আকর্ষণ। মানব জীবনে যৌন আকর্ষণ আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের একটা বিশেষ দিক মাত্র। পারিবারিক জীবনের ভিত্তি ও মানব বংশ রক্ষার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা নারী-পুরুষ সৃষ্টি করে তাদের বয়সের একটা সীমা পর্যন্ত যৌন আকর্ষণ দিয়েছেন। পরিবারের ভিত্তি স্থাপন করে মানব সমাজের শৃংখলা আনয়ন করে মানব বংশ বৃদ্ধি করে ও আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ঘটিয়ে পূর্ণ মানবতা হাসিলের জন্যে দাম্পত্য জীবনে নর-নারীর এক সুনিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের পেছনে এ যৌন আকর্ষণের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় আধ্যাত্মিক প্রেম সাধনায় পাশবিক প্রেম প্রাথমিক সোপানের ন্যায় গণ্য হয়ে থাকে। 'ইশকে মাজাযী' থেকে মানুষ 'ইশকে হাকীকীর' স্তরে উপনীত হতে পারে।

সুতরাং যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তিই বিবাহের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এটা তো যুবক-যুবতীর মনের সাময়িক—সম্পূর্ণ অস্থায়ী অবস্থা মাত্র। স্বামী-স্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ সম্পর্কের একটা দিক মাত্র। একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলেও একমাত্র দিক এটা নয়। এক জোড়া দম্পত্তির পুরো জীবনের সফলতার জন্যে তাদের সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। কাজেই দু'জনের চিন্তাধারা, মন-মানসিকতা

ও আকীদা-বিশ্বাসে সামঞ্জস্য একান্ত অপরিহার্য। কোনো অমুসলিম নারী একজন মুসলিম নরের জন্যে উপযুক্ত নয়, যেমন করে একজন অমুসলিম পুরুষ একজন মুসলিম নারীর সাথী হওয়ার যোগ্য নয়। অমুসলিম নর-নারীর দৈহিক সৌন্দর্য ও আর্থিক সচ্ছলতা এ ক্ষেত্রে মোটেই গণ্য হতে পারে না।

আমাদের সমাজে দেখা যায়, সহশিক্ষার কারণে অনেক স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী যৌন আকর্ষণে পরস্পরকে ভালবেসে মাতা-পিতার প্রতি কলংক লেপন করে ও বেরিয়ে চলে যায়। আর তাদের ঐ সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতায় রূপায়িত হতেও দেখা যায়। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা যায় লাভ মেরেজের প্রায় ৭০% শেষ পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদের সম্মুখীন হয়। কারণসমূহের মধ্যে প্রধানত এর সাময়িক আকর্ষণ, বাহ্যিক ভালবাসা, আবেগ প্রবণতা, অদূরদর্শিতা এবং সর্বোপরি মাতা-পিতার সদিচ্ছার অভাবই এজন্য দায়ি বলে মনে করা হয়।

বিবাহে মানুষের পুরো দুনিয়ার জীবনের জন্য সাথী নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তাই ইসলাম উভয়কে এখতিয়ার দিয়েছে পরস্পরকে দেখে শুনে নেয়ার জন্য। তা ছাড়া বর ও কনের সার্বিক সমতা (কুফু) হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ইসলামে। বিশেষতঃ দীনের ব্যাপারে সতর্কতা অত্যাবশ্যক। আদর্শিক মানসিকতা ও আমলী জিন্দেগীতে বর-কনে যেন অভিন্ন হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

নয়

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ لا وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ج فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (البقرة : ٢٢٢)

"লোকেরা তোমাকে হায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, তা অপবিত্র ময়লা। সুতরাং তোমরা হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীদের সহবাস থেকে দূরে থাক। তারা পবিত্র হওয়ার পূর্বে তাদের (সাথে সহবাস কর না) নিকটে যেও না। যখন তারা পবিত্র হবে তখন আল্লাহর নির্দেশিত স্থানে তাদের কাছে যাও। আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন।"

-(সূরা আল বাকারা ঃ ২২২)

হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে স্বামীর আচরণ

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, ইয়াহুদীরা ঋতুবতী স্ত্রীদের তাদের সাথে খেতে দিতো না। এমনকি তাদের সাথে এক ঘরে ঘুমাতোও না। সাহাবায়ে কিরাম এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। অতপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "তাদের সাথে সঙ্গম ছাড়া সবকিছুই জায়েয।"

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হায়েজ অবস্থায় আমি হাড় চুষে দিলে তিনিও একই স্থানে মুখ দিয়ে চুষতেন। আমি পানি পান করে রেখে দিলে তিনি পাত্রের একই স্থানে মুখ দিয়ে ঐ পানি পান করতেন।

তিনি আরও বলেন, আমার হায়েজ অবস্থায় হুজুর (স) গোসলের সময় আমাকে তাঁর মাথা ধুয়ে দিতে বলতেন। আমার ঐ অবস্থায় তিনি আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন।

হাদীস শরীফে এও রয়েছে যে, একদা হুজুর (স) তাঁর কোনো ঋতুবতী স্ত্রীকে মসজিদ থেকে (জানালা দিয়ে) বিছানা এনে দিতে বললেন। তখন তিনি

ঋতুবতী বলে ওজর পেশ করলে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, إِنَّ حَيْضَكِ لَيْسَتْ بِيَدِكِ তোমার হায়েজ তো তোমার হাতে নয়।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের বর্ণনায় স্ত্রীদের হায়েজ অবস্থায় স্বামীর ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যার মূলকথা অন্যান্য জাতির ন্যায় মুসলিম জাতির স্ত্রীগণ হায়েজ অবস্থায় অস্পৃশ্য হয়ে যায় না। ঐ অবস্থায়ও স্ত্রীরা স্বামীদের সাথে একই বিছানায় শয়ন করতে ও একই পাত্রে খেতে পারে। ইসলাম নারীদের এ প্রাকৃতিক অবস্থায়ও তাদের সাথে স্বাভাবিক ব্যবহার করার রীতি বহাল রেখেছে। অপবিত্রতার কারণে স্ত্রীসংগম করা জায়েয না হলেও তাদের ঐ অবস্থায় অন্যান্য স্বাভাবিক আচার-ব্যবহার বৈধ। এভাবে ইসলাম নারীদের যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা দিয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় পাশ্চাত্যের গবেষকদের নারী সম্পর্কিত মন্তব্যের কথা। তারা ভাবতেন নারীদের আত্মা আছে কিনা ? থাকলে তা কি ধরনের ? কোন্ জাতীয় ? তা কি মানুষের আত্মা?

উক্ত আয়াতের মাঝের অংশে বলা হয়েছে, "যখন তারা পবিত্র হবে তখন আল্লাহর নির্দেশিত স্থানে তাদের কাছে যাও।" অর্থাৎ সহবাস কর। এখানে স্থান বলতে সঙ্গমস্থল অর্থাৎ স্ত্রীলিংগ বুঝানো হয়েছে। স্ত্রীলিংগ ছাড়া অন্য পথে সংগম করলে তা হবে সীমালংঘন জনিত অপরাধ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্যের মতে পায়খানার রাস্তায় রতিক্রিয়া হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে। আজকের পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল (?)-দের দেশে আইন করে সমকামিতা বৈধ করা হয়েছে। এভাবে তারা রুচী বর্জিত হয়ে পশুত্বের পর্যায়ে অবনত হয়েছে। আর অভূতপূর্ব রোগ বিস্তার লাভের পথ সুগম করছে। তথাকথিত সভ্য জাতির মাঝে এমনি ধরনের অসভ্য আচরণ চলছে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ্ তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন।" এখানে আল্লামা ইবনে কাসীরের মতে তাওবাকারী বলতে গুনাহ বর্জনকারী ও হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে ; আর পবিত্রতা অবলম্বনকারী বলতে আল্লাহর নিষিদ্ধ যাবতীয় নোংরামী ও হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীসংগম থেকে বিরত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে।

'أَذًى' -এর দু'টো অর্থ হতে পারে। এক. কষ্ট ও ক্ষতি ; দুই. এমন অপবিত্রতা যা মানুষ অপছন্দ করে। হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যেই কষ্টকর, ক্ষতি ও অপবিত্রতা। স্ত্রীর ক্ষতি হলো, হায়েজ জনিত

ব্যাথার আঘাত লাগা, ব্যথিত শিরায় আঘাত লাগার কষ্ট, জরায়ূর সংকোচন-সম্প্রসারণ, হায়েজে অনিয়মিতা আর স্বামীর ক্ষতি জরায়ু হতে রক্ত মিশ্রিত জীবানু পুরুষাংগের মধ্যে ঢুকে পড়ে নানা রোগের সৃষ্টি করে থাকে। এসব কারণে হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীসংগম নিষেধ করা হয়েছে। উত্তম রূপে পবিত্র হওয়ার পূর্বে স্ত্রীসংগম হারাম করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা নর-নারীকে উপরোক্ত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

দশ

نِسَاۤءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ز وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○(البقرة : ٢٢٣)

"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্যে কৃষি ক্ষেত্র। তাই তোমরা নিজেদের কৃষি ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। তবে নিজেদের জন্যে কিছু যোগাড় করে রাখ। আর আল্লাহকে ভয় কর। জেনে রেখ, তোমাদের অবশ্যই একদিন তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে হবে। আর মুমিনদের সুসংবাদ দাও।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৩)

কেবল লালসাবৃত্তি চরিতার্থই কি স্ত্রীসহবাসের উদ্দেশ্য ?

স্ত্রী জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য এ নয় যে, তারা পুরুষদের "বিহার ক্ষেত্র" হিসেবে ব্যবহৃত হবে। বরং দুনিয়ার জীবন-যাপনে নর-নারী হবে পরস্পরের সহযাত্রী। সহাবস্থানের ব্যাপদেশে বৈধ উপায়ে তাদের সংগমের অনুমতি রয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে তাদের মাঝে সেই স্পৃহাও রয়েছে। কিন্তু তাই বলে নারীদেরকে পুরুষের যৌন ক্ষুধা মিটানোর জন্যেই সৃষ্টি করা হয়নি, সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর পৃথিবীতে মানব বংশ বিস্তার সহ দুনিয়ার জীবন-যাপনে, পুরুষের সহগামী হিসেবে। বরং নর-নারীর পারস্পরিক আকর্ষণ সৃষ্টির পেছনেও সৃষ্টির ক্রমধারা জারী রাখা তথা মানব বংশের বিস্তার সাধন করার উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। উদ্দেশ্য এ নয় যে, সহবাস বা সংগমের কারণে সন্তান হবে, বরং সন্তান উৎপাদনের মাধ্যম ও প্রসেস হলো স্ত্রীসংগম। যে কারণে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকে পুরুষদের কৃষিক্ষেত্র বলে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষেত ও কৃষকের সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন।

সুফিয়ান, আবু নাঈম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে মুনকাদির বলেন, আমি হযরত জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা বলতো পেছনের দিক থেকে স্ত্রীসংগম করলে সেই সংগমের সন্তান টেরা হয়। এ প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইবনে জারিজ একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, পেছন দিক সন্মুখ দিক—যেদিক থেকেই ইচ্ছা মিলতে পারবে, তবে স্থান হবে যৌনদ্বার বা স্ত্রীলিংগ।

ইমাম আহমদ ও সুনান সংকলকগণ একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, বাহায ইবনে হাকীমের দাদা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেন। হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা আমাদের স্ত্রীর কাছে কিভাবে আসবো ? উত্তরে তিনি বললেন, তারা তোমাদের ক্ষেত্র স্বরূপ, তাদেরকে যেভাবে যে দিক থেকে ইচ্ছা ব্যবহার কর। তবে তাদের মুখের উপর মেরো না, গালমন্দ করো না, ক্রোধবশতঃ তাদের থেকে পৃথক হয়ে অন্য ঘরে থেকো না।

আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর বিখ্যাত তাফসীর তাফসীরে ইবনে কাসীরে বহু হাদীস এ প্রসংগে উল্লেখ করেছেন। সবক'টি হাদীসই উপরোক্ত আয়াতের সমর্থক ও ব্যাখ্যা স্বরূপ। অর্থাৎ স্ত্রী সংগম সামনের দিক থেকে ও পেছন দিক থেকে উভয় দিক থেকেই জায়েয ; তবে অবশ্যই যৌনদ্বার হতে হবে। তাউস (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়ে সহবাস করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "তুমি কি আমাকে কুফরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো ?" আল্লামা ইবনে কাসীর এটিকে সহীহ বর্ণনা রূপে লিপিবদ্ধ করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে তার স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়ে সহবাস করে।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে আরেকটি হাদীস আল্লামা ইবনে কাসীর (র) তাঁর তাফসীরে উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি স্ত্রীদের বা পুরুষদের গুহ্যদ্বার দিয়ে সঙ্গম করে সে কুফরী করে।"

আয়াতের শেষাংশে আছে ঃ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ বিভিন্ন তাফসীরে এর তরজমা হলো ঃ

–তোমরা তোমাদের জন্যে কিছু করিও।

–(আল কুরআনুল করীম (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন)

–নিজেদের পরিত্রাণের জন্যে নেক আমল পেশ করতে থাক।

–(ইবনে কাসীর)

–তোমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করিও।–(তাফহীমুল কুরআন)

–নিজেদের জন্যে আগামী দিনের ব্যবস্থা কর।–(মাআরেফুল কুরআন)

এ আয়াতাংশের দু'টো অর্থ হতে পারে। এক. নিজের বংশ রক্ষার জন্যে চেষ্টা কর। যেন তোমার মৃত্যুর পর তোমার স্থলাভিষিক্ত বর্তমান থাকে। দুই.

নবাগত বংশধরকে তোমার স্থলাভিষিক্ত করতে হলে দ্বীন ইসলাম, নৈতিক চরিত্র তথা মনুষ্যত্বের ভূষণে ভূষিত করার চেষ্টা কর। পরবর্তী আয়াতাংশে সতর্ক করে বলা হয়েছে এ ব্যাপারে যদি ইচ্ছাকৃত অবহেলা ও ত্রুটি দেখাও তবে সে জন্যে অবশ্যই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

–(তাফহীমুল কুরআন)

এগার

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ج فَاِنْ فَاؤُ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ (البقرة : ٢٢٦-٢٢٧)

"যারা নিজেদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক না রাখার প্রতিজ্ঞা (ঈলা) করে বসে, তাদের জন্যে চার মাসের অবকাশ রয়েছে। তারপর তারা যদি মিলমিশ করে নেয় তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর যদি বর্জন করার সংকল্প করে নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।"

স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার কসম করলে

যদি কোনো ব্যক্তি কিছুদিন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার কসম করে বসে, তবে সেই কসমকে শরীয়তের পরিভাষায় 'ঈলা' বলা হয়। এ বিচ্ছিন্নতার সময় চার মাসের কম হলে সময় গত হওয়ার অপেক্ষা করবে, স্ত্রীও ধৈর্যধারণ করবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার এরূপ সম্পর্ক সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক হতে পারে না। তবুও মাঝে মধ্যে এরূপ বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহর শরীয়তে এমন বিপর্যয় অপছন্দনীয়। এ ধরনের বিপর্যয়ের জন্যে আল্লাহ তা'আলা চার মাস সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ চার মাসের মধ্যে হয় পুনরায় স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনস্থাপন করবে। অন্যথা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক একেবারেই ছিন্ন করবে, যেন বসবাসযোগ্য অন্য কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

এ আয়াতে প্রতিজ্ঞা বা কসম করার হুকুমের ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের মতে স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক না রাখার প্রতিজ্ঞা করে, কেবল তখনই আলোচ্য আয়াতের প্রয়োগ হবে। আর প্রতিজ্ঞা না করেই যদি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ত্যাগ করা হয় তবে এমতাবস্থায় যত কালই অতিবাহিত হোক না কেন, এ আয়াত সেখানে প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু মালেকী মাযহাবের শাস্ত্রবিদদের মতে প্রতিজ্ঞা করা হোক আর না-ই হোক, উভয় অবস্থায়ই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক না রাখার ব্যাপারে এ চার মাস কাল সময়ই চূড়ান্ত ফায়সালার জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে। ইমাম আহমদের একটি মতও এরই সমর্থনে রয়েছে।

হযরত আলী (রা), হযরত আব্বাস (রা) এবং হাসান বসরী (র)-এর মতে এ নির্দেশ কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিপর্যয় দেখা দেয়ার কারণে সম্পর্ক ত্যাগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষ কোনো সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যদি স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়, অথচ মনের দিক থেকে পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা, পূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকে ; তবে তার জন্যে এ আয়াত প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু অন্যান্য ফিক্হ শাস্ত্রবিদদের মতে যে কোনো ধরনের প্রতিজ্ঞা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দৈহিক সম্পর্ক ছিন্ন করলে তাকে 'ঈলা' বলা হবে। আর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি যে কোনোভাবেই হোক না কেন, চার মাসের অধিক এরূপ অবস্থা বর্তমান থাকা উচিত হবে না।

ইমাম বুখারী ও মুসলিমের সহীহ্ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) একবার এক মাসের জন্যে 'ঈলা' করেছিলেন এবং ঊনত্রিশ দিন পরে বলেন, ঊনত্রিশ দিনেও মাস হয়ে থাকে।

চার মাস সময়ের অধিক সময় ঈলা করলে স্ত্রীর স্বামীর কাছে এ আবেদন করার অধিকার থাকবে যে, হয়ত সে মিলিত হবে, না হয় তালাক দেবে। অতপর বিচারক স্বামীকে দু'টোর মধ্যে একটি পথ গ্রহণ করতে বাধ্য করবে যেন মহিলাকে দুর্ভোগ পোহাতে না হয়।

আয়াতে فَاِنْ فَاۤؤُا (তারা যদি মিলে যায়) বলে বুঝানো হয়েছে যে, তারা যদি পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায় অর্থাৎ সহবাস করে। ইবনে আব্বাস (রা) মাসরূক (র) সাঈদ ইবনে যোবায়ের প্রমুখ মনীষীগণ এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো ফিক্হ শাস্ত্রবিদ এর এ অর্থ নিয়েছেন যে, ঐ সময়ের মধ্যে ঐ স্বামী যদি নিজের প্রতিজ্ঞা ভংগ করে এবং পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করে নেয় ; তবে তাকে প্রতিজ্ঞা ভংগের জন্য কাফ্ফারা দিতে হবে না। আল্লাহ এমনিই মাফ করে দেবেন। কিন্তু অধিকাংশ ফিক্হ শাস্ত্রবিদের মতে প্রতিজ্ঞা ভংগের কাফ্ফারা অবশ্যই দিতে হবে। ক্ষমাশীল ও দয়াবান হওয়ার অর্থ এ নয় যে, কাফ্ফারাও মাফ করে দেবেন বরং এর অর্থ আল্লাহ এ কাফ্ফারা কবুল করে নেবেন ; আর সম্পর্ক ত্যাগ করার সময় পরস্পরের প্রতি যে বাড়াবাড়ী হয়েছে তা ক্ষমা করে দেবেন।

হযরত উসমান (রা), ইবনে মাসউদ (রা), যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) প্রমুখের মতে প্রতিজ্ঞা ভংগের ও পুন সম্পর্ক স্থাপনের সময় চার মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তালাক পড়ে যাবে। অর্থাৎ এক তালাক বায়েন হবে, মানে ইদ্দত পালনের সময় স্বামী তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারবে না। অবশ্য উভয়ের ইচ্ছা থাকলে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। হানাফী মাযহাবের ফকীহগণও এমতই গ্রহণ করেছেন।

বার

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا ط ـ(البقرة : ٢٢٨)

"যেসব নারীকে তালাক দেয়া হয়েছে, তারা তিন হায়েজ পর্যন্ত নিজেদেরকে অপেক্ষায় রাখবে। আর আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন, তা যেন তারা গোপন না রাখে—এটা তাদের জন্যে জায়েয নয়, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে—তাওহীদ ও আখেরাতে যদি ঈমান থাকে। আর তাদের স্বামীদের এ অধিকার আছে যে তারা ইচ্ছা করলে এ অবকাশের মধ্যে সদ্ভাব রাখতে চাইলে নিজ স্ত্রীদের ফিরিয়ে নিতে পারে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮)

স্ত্রীকে তালাক দেয়া ঃ ইদ্দত ও প্রত্যাহারের সময়সীমা

এ আয়াতের নির্দেশের উপর আমল করার ব্যাপারে ফিক্‌হবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল ফকীহর মতে তৃতীয় তালাক থেকে পাক হয়ে গোসল না করা পর্যন্ত বাইন তালাক সংঘটিত হবে না ; এবং স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। হযরত আবু বকর (রা), ওমর (রা), আলী (রা), ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) প্রমুখ বড় বড় সাহাবীদের এটাই মত। হানাফী মাযহাবের ফকীহগণও এ মতই নিয়েছেন। আরেক দলের মতে তৃতীয় হায়েজ আসার সাথে সাথেই তাকে ফিরিয়ে নেয়ার স্বামীর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। হযরত আয়েশা (রা), ইবনে উমর (রা), যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) এ মত প্রকাশ করেছেন। শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের ফকীহগণও এ মতই গ্রহণ করেছেন। এখানে স্মরণ রাখতে হবে এ হুকুম কেবল তখনি প্রযোজ্য হবে যখন স্বামী স্ত্রীকে এক কিংবা দুই তালাক দেয়। কারণ, তিন তালাক দেয়ার পর ফিরিয়ে আনার আর কোনো অধিকার থাকে না।–(তাফহীমুল কুরআন)

স্ত্রীর জুরায়ুতে যা কিছু থাকবে তা তাকে অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে। এটা তার ঈমানের দাবী। আল্লাহ ও আখিরাতের বিশ্বাসী কেউ আল্লাহর

নির্দেশের বিপরীত করতে পারে না। তাই জরায়ুতে গর্ভধারণ অথবা ঋতুস্রাব যাই হোক এসব বিষয়ে গোপন করবে না। কারণ এসব বিষয় গোপন করতে গেলে ইদ্দতের হিসাব ভুল হয়ে যাবে।

আয়াতে اِنْ اَرَادُوٓا اِصْلَاحًا (তারা যদি সদ্ভাব রাখার ইচ্ছা করে) বলে একথা বুঝানো হয়েছে যে, তালাকে রাজয়ী হয়ে থাকলে স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে তা হতে হবে সংশোধনের উদ্দেশ্যে। শাস্তি দেয়া, প্রতিশোধ নেয়া, বা জ্বালাতন ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে নেয়া একান্ত গর্হিত কাজ সম্পূর্ণ না-জায়েয। অবশ্য শরীয়ত মতে রাজয়াত (পুনঃ গ্রহণ) হয়ে যাবে কিন্তু নির্যাতনের নিয়তের কারণে অবশ্যই আল্লাহর কাছে গুনাহগার হতে হবে।

মুমিনগণ সর্বদা শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করে থাকে। 'তালাক' দাম্পত্য জীবনের জন্য মারাত্মক শব্দ ও ঘৃণ্য কাজ। সুতরাং এ শব্দ উচ্চারণ ও এ কাজ করার প্রতি অত্যধিক সচেতনতা ঈমানের দাবী। ইসলামী শরীয়তে সবচেয়ে ঘৃণিত (ابغض المباحات) থেকে বিরত থাকা উত্তম।

তের

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○(البقرة : ٢٢٨)

"আর নারীদের জন্যেও ন্যায়সংগতভাবেই ঠিক সেসব অধিকার রয়েছে যেমন তাদের উপর রয়েছে পুরুষদের অধিকার। অবশ্য তাদের উপর পুরুষদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।"-(সূরা আল বাকরা ঃ ২২৮)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মর্যাদার মূলনীতি

নারীদের উপর যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে। তেমনি পুরুষদের উপরও রয়েছে নারীদের অধিকার। আর উভয়কেই উভয়ের অধিকার প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। তবে এতটুকু পার্থক্য আছে যে, পুরুষদের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা অধিক। এ আয়াতে সেই দিকেই ইংগিত করে বলা হয়েছে ঃ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ অর্থাৎ নারীদের তুলনায় পুরুষদের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা।

সূরা নিসায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط -(النساء : ٣٤)

"পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। কারণ, আল্লাহ তাদের একের উপর অপরকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন এবং এ জন্যে যে পুরুষরা নারীদের পেছনে তাদের সম্পদ ব্যয় করেছে।"

আল কুরআনে সূরা আল বাকারার এ ছোট আয়াতাংশে নর-নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিরাট বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। এতে নারী-পুরুষের অধিকার সম্পর্কিত মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য পালন সমভাবে ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু আয়াতাংশে স্ত্রীলোকদের অধিকারের কথা পুরুষদের অধিকারের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ

পুরুষদের উচিত তারা যেন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নারীদের অধিকার প্রদান করে। কারণ, পুরুষ তো নিজের বাহুবলে ও আল্লাহ্ প্রদত্ত মর্যাদা বলে নারীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় করে নেয়। কিন্তু পুরুষদের উচিত নারীদের অধিকারের কথা চিন্তা করা। কেননা সাধারণত নারীরা শক্তি দিয়ে নিজ অধিকার আদায় করতে পারে না।

আল্লাহর বাণীর শব্দাবলী খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে مِثْلُ শব্দ দিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর কর্তব্য ও অধিকারের সমতার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উভয়ের প্রতি উভয়ের অধিকার সমান। তাই বলে এর মানে এ নয় যে, উভয়কেই একই ধরনের কাজ করতে হবে এবং তাদের কর্মস্থল অভিন্ন হবে। কারণ প্রকৃতিগতভাবেই তাদেরকে দৈহিক আকৃতি, গঠন, শক্তি ও সামর্থ্যের পার্থক্য করা হয়েছে। যে কারণে তারা সামাজিক ও পারিবারিক কাজে পরস্পরের বিকল্প নয় বরং পরিপূরক বা সম্পূরক।

আল কুরআনে পুরুষদের বিশেষ মর্যাদা দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ পুরুষদের জন্যে নারীদের তুলনায় বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এখানে পুরুষদেরকে স্ত্রীদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মদার ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন সূরা আন নিসায় قَوَّامُونَ বলে পুরুষদেরকে কর্তৃত্বশীল বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্ব দান এজন্যে যে, পুরুষদের দৈহিক গঠন ও মানসিকতার সৃষ্টিগত পার্থক্যের দরুন তারা কর্তৃত্ব করারই উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীদের যাবতীয় ভরণ পোষণের দায়িত্ব স্বামীরই উপর বর্তায়। আর স্ত্রীগণ হচ্ছে তাদের সহযোগী মাত্র। আল-কুরআনের ভাষায় স্ত্রীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যেমন জঘন্য অন্যায় তেমনি তাদের বল্গাহীনভাবে পুরুষদের আওতা মুক্ত করে দেয়াও নিরাপদ নয়। বৈষয়িক জীবনে স্ত্রীদের পুরুষদের সম্পূর্ণ আওতামুক্ত করা নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে করে পৃথিবীতে রক্তপাত, ফিতনা-ফাসাদ ও বিবাদ-বিষম্বাদের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর সমাজে বিস্তার লাভ করে লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন সমাজকে করে কলুষিত।

আজকের বিশ্বে নারী প্রগতি ও নারীর অধিকারের নামে নারীকে পুরুষদের বিকল্প হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। অথচ সৃষ্টি রহস্যে নর-নারী হলো পরস্পরের পরিপূরক বা সম্পূরক। আল-কুরআন নারীকে তার স্বাভাবিক মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু তথাকথিত প্রগতিবাদীরা নারীকে স্বভাব-প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুরুষদের কর্মস্থলে টেনে এনে সমান অধিকারের কথা বলে তাদের কাঁধে দিয়ে বসেছে দ্বিগুণ বোঝা। স্বভাব-প্রকৃতির দেয়া নারীত্বের দায়িত্ব আর তারই সাথে কথিত

প্রগতিবাদীদের আরোপিত পুরুষের সমান পুরুষোচিত দায়িত্ব। এতে করে নারীদের প্রতি বাড়তি যুলুমই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে মাত্র। প্রকৃতিগতভাবে নারীত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব তাদের পালন করতেই হচ্ছে। আবার পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রতিযোগী হয়ে উপার্জনের দায়িত্বও তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে।

সামাজিক শান্তি শৃংখলা মানব চরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, সর্বোপরি স্ত্রীলোকদের সুবিধার্থেই পুরুষকে স্ত্রীদের উপর কিছুটা প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু তা পালন করা ফরয করেও দেয়া হয়েছে। এর অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, পুরুষরা স্ত্রীদের সাথে যথেচ্ছ আচরণ করবে অথবা স্বামীরা স্ত্রীদের ঘরের আসবাবপত্র বা গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারের মত ব্যবহার করবে। বরং পুরুষদের এ বিশেষ মর্যাদাটুকু রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এজন্যেই বরাদ্ধ করা হয়েছে যাতে পৃথিবীর 'জীব পরিবেশ' তথা মানব পরিবেশের সামগ্রিক ভারসাম্য সংরক্ষিত হয়।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, একমাত্র ইসলামই নারীদের যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। কথাটা এজন্যে প্রশ্নাতীত সত্য যে ইসলাম তথা কুরআন-সুন্নাহ সেই আল্লাহরই দেয়া বিধান, যে আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন—তাদের নর-নারীতে শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। আর আল্লাহর চেয়ে তার সৃষ্টির কল্যাণ করার যোগ্যতা কার আছে?

নারীর সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আল কুরআনে বলা হয়েছে وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সদাচরণ করে জীবন-যাপন কর; হাদীসে এসেছে خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ "তোমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।" তা ছাড়া اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ "বেহেশত মায়েদের পদতলে" ইত্যাদি।

. নারীগণের অর্থনৈতিক অধিকার ইসলাম ছাড়া আর কোথাও নেই বলা চলে। ইসলাম নারীকে তারই হাতে সমস্ত মোহরানার টাকা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। স্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক মোহরের অর্থ তাকে দিতে হয়। আর মোহরের পরিমাণ হতে হবে মর্যাদার ভিত্তিতে। টাকা স্ত্রীকেই দিতে হয় আর তাতে স্বামীর কোনো অধিকারই থাকে না। আর তখন থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব স্বামীর উপরই ন্যস্ত। কসমেটিক্স থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যয়ভার স্বামীকে বহন করতে হয়। এমনকি স্ত্রীর আয়ের উৎস থাকলেও তার ব্যয়ভার স্বামীর উপরই বর্তায়। তার আয়ের মালিক সেই হবে অথচ তার ব্যয়ভার সম্পূর্ণরূপে বহন করবে স্বামী। পিতা-মাতার সম্পত্তিতে ও

স্বামীর সম্পত্তিতেও তার হিস্যা সংরক্ষিত আছে। নারীর এতবড় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিশ্বের অন্য কোনো জাতির মধ্যে নেই। মুসলিম মহিলারা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই মতলববাজদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এত সুন্দর খোদায়ী ব্যবস্থা তথা ইসলামী জীবন পদ্ধতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে দেখা যায়। কতই না ভাল হতো, যদি শিক্ষিতা মহিলারা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করতো।

আজকের সমাজে আল্লাহর দেয়া উপরোক্ত বিশেষ মর্যাদার অপব্যবহার করে পুরুষরা নারীদের উপর যেমন চালাচ্ছে নির্যাতন ও অত্যাচার ; তেমনি এ নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতির নামে এবং নারী স্বাধীনতার ধূয়া তুলে অবলা নারীদের নামিয়ে আনা হচ্ছে পুরুষদের কর্মস্থলে। নারী মুক্তির আকর্ষণীয় যবনিকার অন্তরালে তাদের গণ্য করা হচ্ছে ভোগ্য পণ্যে বা ভোক্তার দ্রব্যে। মানব ইতিহ-াসের সামগ্রিক পরিণতির প্রতি লক্ষ্য রেখে এগুতে অক্ষম অসহায় নারী সমাজ অপরিণামদর্শী ও সামগ্রিক কল্যাণ সম্পর্কে অজ্ঞ পণ্ডিতমন্য কতিপয় পুরুষের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের চরম অবমাননা ও লাঞ্ছনা গঞ্জনার হাতে সঁফে দিচ্ছে। আজকের পাশ্চাত্যের নারী সভ্যতার ইতিহাস একথার জ্বলন্ত সাক্ষী। তবুও কি মুক্তিকামী নারী সমাজের বোধোদয় হবে না ? অন্যথা অনাগত প্রজন্ম এদের কখনো ক্ষমার চোখে দেখবে না। তাদের আদালতে এদের দেখতে পাওয়া যাবে আসামীর কাঠ গড়ায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা নারীদের তুলনায় পুরুষদের বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন। তাই তাদের (পুরুষদের) অতি ধৈর্য ও সতর্কতা সহকারে চলা উচিত। যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে কতর্ব্য পালনে কোনো প্রকার গাফলতি বা ত্রুটি দেখা যায়, তবে তা সহ্য করে নেবে এবং স্ত্রীদের প্রতি নিজের কর্তব্য পালনে মোটেই অবহেলা করবে না।

পরিশেষে আল্লাহর নিজের বৈশিষ্ট্য প্রসংগে স্বয়ং তাঁরই কথা وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ "আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী" বলে ইংগিত করা হয়েছে যে নর-নারীর বৈশিষ্ট্যের তারতম্য ও পুরুষদের কিছুটা অতিরিক্ত মর্যাদাদান কোনো প্রকারের বৈষম্য সৃষ্টি বা পক্ষপাতিত্বজনক নয় ; বরং তাঁর অসীম জ্ঞান ও অনুপম ক্ষমতার কারণেই তিনি সৃষ্টিকূলের বৈশিষ্ট্য ও তারতম্য সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন বিধায় যা কল্যাণকর তাই করে থাকেন। সৃষ্টির সার্বিক মঙ্গল কোন্ পথে—তা একমাত্র স্রষ্টাই জানেন। তাই তিনি সেভাবেই সুশৃঙ্খল নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

চৌদ্দ

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ط(البقرة : ٢٢٩)

"তালাক দু'বার। তারপর হয় সোজাসুজি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে, না হয় ন্যায়ভাবে তাকে বিদায় দেবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯)

স্ত্রীকে বর্জন করতে হলে তা করবে সহৃয়তার সাথে

এ সংক্ষিপ্ত আয়াতাংশে আরবের জাহেলী যুগের এক সামাজিক ত্রুটির সংশোধন করা হয়েছে। আরব দেশে এক এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে অসংখ্যবার তালাক দিয়ে থাকতো। কোনো স্ত্রীর উপর স্বামী বিরূপ হলে তাকে বার বার তালাক দিয়ে আবার ফেরত নিতো। ফলে এ অসহায় নারীরা না পুরোপুরি স্বামী সংগ পেতো, না তার বন্ধনমুক্ত হয়ে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারতো। কুরআন মজিদের আলোচ্য আয়াত এ যুলুমের পথই বন্ধ করেছে। এখানে আল-কুরআন স্বামীকে প্রয়োজনে কেবল দু'বার তালাক দেয়ার অধিকার দিয়েছে। তারপর হয় স্ত্রীকে নিয়মানুযায়ী রেখে দেবে, না হয় সহৃদয়তার সাথে তাকে বর্জন করবে।

আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইবনে জারীরের তাফসীর থেকে একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাহলো জাহেলী যুগে স্বামীরা স্ত্রীদের যতবার ইচ্ছা ততবার তালাক দিতো এবং ইদ্দত চলাকালীন সময়ে তাদের ফিরিয়ে আনতো। এমনিভাবে রাসূল (স)-এর যামানায় একজন আনসার রাগান্বিত হয়ে তার স্ত্রীকে বলেছিল, আমি তোমাকে একেবারে ছেড়েও দেব না, আবার রাখবও না। মহিলা বললেন, তা কিভাবে ? আনসার বললেন, তোমাকে তালাক দেব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে ফিরিয়ে আনবো। আবার তালাক দেব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে ফিরিয়ে নেব। এভাবে করতে থাকবো। মহিলাটি একথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গিয়ে আরয করলো। তারপর কুরআনের উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। হাদীস বর্ণনাকারী আরও বলেন, তারপর থেকে লোকজন তালাকের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায় এবং অসংযমী ব্যক্তিরাও সংযমী হয়ে উঠে। এতে করে পুরুষদের এতদিনের বাড়তি অধিকার রহিত হয়ে যায়।

আয়াতে দু' তালাক দেয়ার পর হয় নিয়মানুযায়ী স্ত্রীকে রাখার অথবা সহৃদয়তার সাথে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ দু' তালাক প্রদানের পর স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে আকে পুনরায় গ্রহণের অধিকার স্বামীর রয়েছে। কিন্তু স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করার ও তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করার মনোভাব থাকতে হবে। তাকে যন্ত্রণা দেয়ার মনোভাব অবশ্যই পরিহার করতে হবে। আর যদি বাইন তালাক দেয়ার ইচ্ছা থাকে তবে ইদ্দত পূর্ণ করতে দিয়ে তাকে সহৃদয়তার সাথে বর্জন করবে। তাকে পুন বিবাহের সুযোগ দিবে, তার অধিকার হরণ অথবা ক্ষতি সাধন করার জন্যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম।

ইসলামে বিয়ের চুক্তি সম্পাদন করা হয় সারা জীবনের জন্যে। এ চুক্তি যাতে অটুট থাকে তৎ প্রতি অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়। কারণ এ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম কেবল স্বামী-স্ত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তাতে পরবর্তী বংশ ও সন্তানাদির জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়ে। এমনকি অনেক সময় উভয়ের মধ্যে সুদূর প্রসারী ঝগড়া-বিবাদ লেগে যায়, আর তাতে সংশ্লিষ্ট সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যেসব কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয় সেগুলো নিরসনের জন্যে কুরআন-হাদীস সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবস্থা করেছে। প্রথমতঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দিন দিন যাতে গাঢ় হয় এবং কখনো ছিন্ন না হয় তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্যে কুরআন ও হাদীস উপদেশ দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কখনো কোনো কারণে অসহযোগিতা দেখা দিলে পরস্পরকে বুঝাবার ব্যবস্থা করার প্রতি ইসলাম লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। তৃতীয়তঃ সৃষ্ট অসহযোগিতার উপর বেশ সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শন করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। চতুর্থতঃ উপরোক্ত পদক্ষেপেও যদি কোনো ফল না হয়, তবে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তিকে সালিস সাব্যস্ত করে ব্যাপারটির মীমাংসা করতে হবে বলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল কুরআনের নির্দেশ ঃ حَكَمًا مِنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا অর্থাৎ স্বামীর পরিবারের মধ্য হতে সালিস ও স্ত্রীর পরিবারের মধ্য হতে সালিস স্থির করে সমাধানের চেষ্টা করা। এখানে উভয়ের পরিবার থেকে সালিস স্থির করার নির্দেশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বিষয়টিকে যদি পরিবারের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তিক্ততা ও মনের দূরত্ব আরও বেশী বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পঞ্চমতঃ যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ অবস্থা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যে সংশোধনের কোনো চেষ্টাই কাজে না লাগে এবং বৈবাহিক সম্পর্কের আকাংখিত ফল লাভের পরিবর্তে উভয়ের মিলেমিশে থাকাও মস্তবড় আযাবের কারণ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়াই উভয় পক্ষের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা হতে পারে। এ অসহনীয় অবস্থা ও শ্বাসরুদ্ধকর

পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্যেই ইসলামে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান রয়েছে। তালাক হচ্ছে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম হালাল কাজ। হাদীসের ঘোষণা হলো ঃ اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ اَلطَّلَاقُ অর্থাৎ আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম হালাল বিষয় হচ্ছে 'তালাক'।

তালাক দেয়ার শরীয়তসম্মত বিধান হলো বড়জোর দুই তালাক পর্যন্ত দেয়া যাবে। তৃতীয় তালাক দেয়া উচিত হবে না বলে কতিপয় বিশিষ্ট ফকীহ্ মতামত ব্যক্ত করেছেন। এজন্যেই ইমাম মালেক ও অন্যান্য অনেক ফকীহ্ তৃতীয় তালাক দেয়ার অনুমতি দেননি। তাঁরা একে তালাকে বেদআত বলেছেন। অবশ্য অন্যান্য ফকীহগণ তিন তহুরে তিন তালাক পৃথক পৃথকভাবে দেয়া জায়েয বলেন। এসব ফকীহ্ একেই সুন্নাত তালাক বলেছেন।

আল কুরআনে اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ তালাক দু'বার বলে পরবর্তী পর্যায়ে বলেছে فَاِنْ طَلَّقَهَا অর্থাৎ তৃতীয়বার যদি তালাক দিয়ে দেয় তখন বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যাবে। এবং তা প্রত্যাহার করার কোনো অধিকার থাকবে না। তবে দ্বিতীয় বিবাহ করার পর সেই স্বামী কোনো কারণে তালাক দিয়ে দিলে তখন প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারবে। অবশ্য দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার সহবাস হওয়া শর্ত। এটি হচ্ছে তাদের শাস্তি স্বরূপ। আর এ জায়েয কাজটি মূলত হারামের একান্ত নিকটবর্তী।

পনের

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَّخَافَا اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ لا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ (البقرة : ٢٢٩)

"আর নিজেদের দেয়া কোনো কিছু স্ত্রীদের থেকে ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্যে জায়েয নেই। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় স্বরূপ কিছু দিয়ে অব্যাহতি পেতে চায়, তবে উভয়ের কারোই কোনো গুনাহ নেই। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। যারা আল্লাহর সীমালংঘন করবে তারাই যালিম।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯)

সম্পর্ক ছিন্ন করার নিয়তে নিজেদের দেয়া কোনো কিছু স্ত্রীদের থেকে ফেরত নেয়া হারাম

কোনো কোনো অত্যাচারী স্বামী তার স্ত্রীকে রাখার নিয়ত রাখে না। এমতাবস্থায় তাকে তালাকও দেয় না আবার তার অধিকার আদায় করারও চিন্তা করে না। এতে স্ত্রী যখন অতীষ্ঠ হয়ে পড়ে, সেই সুযোগ নিয়ে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু অর্থকড়ি আদায় করার বা মোহর মাফ করিয়ে নেয়ার বা ফেরত নেয়ার দাবী করে বসে। অনেক সময় কলে-কৌশলে স্ত্রীকে দেয়া গহনা বা কাপড়-চোপড় কেড়ে নিয়ে তাকে খালি হাতে বিদায় দেয়। আল কুরআন এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا ـ

"আর তোমাদের স্ত্রীদের দেয়া কোনো কিছু তাদের থেকে ফেরত নেয়া তোমাদের জন্যে হালাল নয়।"

অর্থাৎ তালাকের পরিবর্তে তোমাদের দেয়া অর্থ-সম্পদ বা মোহর ফেরত নেয়া হারাম।

অবশ্য একটি ব্যাপারে তা থেকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে মোহর ফেরত নেয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রী এমন অনুভব করে "মনের গরমিলের কারণে আমি স্বামীর হক আদায় করতে পারিনি" এবং স্বামীও যদি তাই বোঝে, তবে এমতাবস্থায় মোহর ফেরত নেয়া বা তা ক্ষমা করিয়ে নেয়া এবং এর পরিবর্তে তালাক নেয়া জায়েয হবে।
–(মাআরেফুল কুরআন)

স্ত্রীদের নিকট থেকে নিজের দেয়া সম্পদের কিছু ফেরত নেয়া জায়েয নেই। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, আর সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে এতে কারো পাপ নেই।

অবশ্য স্ত্রী যদি স্বামীর কোনো অপরাধ ছাড়া তার থেকে অব্যাহতি চায়, তবে তাতে গুনাহ রয়েছে। হযরত ইবনে জারীর থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "স্বামীর বিনা অপরাধে স্ত্রী যদি তার কাছে তালাক প্রার্থনা করে তাহলে জান্নাতের ঘ্রাণও তার নসীব হবে না।"
–(ইবনে কাসীর)

হাবীবা বিনতে সহল (রা) সাবিত ইবনে কায়েস (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সাবিত (রা) ছিলেন অত্যন্ত কুৎসিত ব্যক্তি। তাই হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করে বললেন, আল্লাহর কসম, আমার যদি আল্লাহর ভয় না থাকতো তাহলে তিনি আমার কাছে আসলেই আমি তার মুখে থু থু মেরে দিতাম। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাকে দেয়া তার বাগানটি কি তাকে ফিরিয়ে দিতে রাজি আছ? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, রাজি আছি। তিনি বাগানটি তাকে ফিরিয়ে দেন। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেন। ইসলামের পরিভাষায় এ বিচ্ছিন্নতাকে 'খোলা' خُلْعٌ বলে। অবশ্য খোলার ব্যাপারে স্বামীর স্ত্রীকে দেয়া বস্তুর চেয়ে বেশী নেয়া জায়েয কিনা সে বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

অল্প-বেশী, তুচ্ছ-মূল্যবান যাকিছু স্ত্রীর আছে তা সবই গ্রহণ করা যাবে একমাত্র চুলের বেণী ছাড়া। ইমাম আবু হানিফা (র)-এর সহচরবৃন্দের অভিমত হলো, স্ত্রীর দোষে খোলা হয়ে থাকলে স্বামী তার প্রদত্ত সব সম্পদই

গ্রহণ করতে পারবে। তার অতিরিক্ত গ্রহণ বৈধ নয়। হ্যাঁ, স্ত্রী স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত দান করলে তা জায়েয হবে। পক্ষান্তরে স্বামীর দোষে খোলা হয়ে থাকলে স্বামী কিছুই ফেরত পাবে না। তবে স্ত্রী স্বেচ্ছায় দান করলে তা স্বামীর জন্যে বৈধ। ইমাম আহমদ (র), আতা, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব প্রমুখের মতে যে কোনো অবস্থায় স্বামী নিজের দেয়া বস্তুর অতিরিক্ত গ্রহণ করা জায়েয নেই। হযরত আলী (রা) বলেন, খোলা গ্রহণকারী মহিলা থেকে তাকে প্রদত্ত বস্তুর চেয়ে অধিক কিছু গ্রহণ করো না। ইমাম আওযাঈ বলেন, বিচারকগণ স্ত্রীর নিকট থেকে স্বামীর প্রদত্ত বস্তুর অধিক কিছু গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে বৈধ মনে করেন না।−(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

মোটকথা, মোহরানা, অলংকার ও কাপড় ইত্যাদি যাকিছু স্বামী স্ত্রীকে দিয়েছে, তার কোনো একটি জিনিসও সে ফিরে পেতে পারে না—সে অধিকার তার নেই। কেউ কোনো ব্যক্তিকে উপহার, হেবা ইত্যাদি বাবদ কিছু দিয়ে থাকলে তা পুনরায় ফেরত নেয়া ইসলামের সাধারণ নৈতিক নিয়মের বিপরীত। এরূপ হীন ও নিকৃষ্ট কাজকে হাদীস শরীফে এমন কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে নিজের বমি নিজে ভক্ষণ করে। বিশেষত নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিদায় করার সময় তাকে প্রদত্ত সবকিছু কেড়ে নেয়া স্বামীর পক্ষে বাস্তবিকই অত্যন্ত লজ্জাস্কর কাজ। বরং ইসলাম তো এ চরিত্র শিক্ষা দিয়েছে যে, তালাক দিয়ে বিদায় করার সময় স্ত্রীকে কিছু না কিছু দিয়েই বিদায় করা উচিত।

−(তাফহীমুল কুরআন)

ষোল

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يَّتَرَاجَعَاۤ اِنْ ظَنَّاۤ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ (البقرة : ٢٣٠)

"অতপর যদি স্বামী (তৃতীয়) তালাক দিয়ে বসে, তাহলে অন্য স্বামীর ঘর করার পূর্বে সে এই ব্যক্তির জন্যে হালাল হবে না। দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দিয়ে দেয় (অথবা মৃত্যুবরণ করে) তাহলে প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এতে তাদের কোনো গুনাহ হবে না, যদি তাদের আত্মবিশ্বাস থাকে যে, তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখায় থাকতে পারবে। এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, যা আল্লাহ বুঝের লোকের জন্যে বর্ণনা করেন।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩০)

যখন তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে না

এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতসমূহেরেই শেষাংশ বা ধারাবাহিকতার শেষ সীমা। কেউ তার স্ত্রীকে দুই তালাক দেয়ার পর যদি পুনরায় তৃতীয় তালাক দিয়ে বসে তবে বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যায়। দ্বিতীয় তালাকের পরে ইদ্দতের মধ্যে প্রত্যাহার করার অথবা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বিবাহ নবায়ন করার যে সুযোগ ছিল, এখন (তৃতীয় তালাকের পর) আর ঐ সুযোগ থাকলো না। কেননা এমতাবস্থায় ধরা যায় যে, স্বামী সবকিছু বুঝে শুনেই স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে। তাই এখন তার শাস্তি হলো তারা উভয়ে একমত হলেও বিবাহের নবায়নও করতে পারবে না। তাদের পুনর্বিবাহের শর্ত হলো স্ত্রী ইদ্দত শেষে অন্য স্বামী গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাসের পর যদি সেও তাকে তালাক দিয়ে দেয় অথবা সে মারা যায়, তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

কুরআন ও হাদীসের বাণী এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের কার্যপদ্ধতিতে দেখা যায়, যখন কোনো দম্পতির তালাক ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প থাকে না, তখনই কেবল তালাক দেয়ার পথে এগুবে। আর তখন উত্তম পন্থাই অবলম্বন করবে। তা হচ্ছে এমন তহুরে তালাক দিবে যাতে সহবাস করা

হয়নি। এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে। ইদ্দত শেষ হলে বিবাহ সম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। এটাই তালাকের উত্তম পন্থা। আর তারা ভাল মনে করলে ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলেই চলবে। ইদ্দত শেষে বিবাহ ভঙ্গ হয়ে গেলেও তারা ইচ্ছা করলে তা নবায়ন করতে পারে।

কেউ যদি উত্তম পন্থার ভ্রূক্ষেপ না করে ইদ্দতের মধ্যে আরো এক তালাক দিয়ে বসে, তবে সে বিবাহ ছিন্ন করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এগিয়ে গেল। এবারও সে পূর্বের মত ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার অথবা ইদ্দত শেষে বিবাহ নবায়ন করতে পারে। অবশ্য দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্পর্ক রক্ষার সর্বশেষ স্তরে উপনীত হয়ে গেলো। এখন সে এমন এক সীমারেখায় পদার্পণ করলো যে, আর এক তালাক দিলে তাদের সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে যায় এবং স্বামী তার অধিকারের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দিলো।

তালাকের নিকৃষ্ট পন্থা

ইসলামে তালাক মূলত একটি অপসন্দনীয় কাজ। জায়েয কাজসমূহের মধ্যে এটি হচ্ছে নিকৃষ্টতম। এতদসত্ত্বেও এছাড়া কোনো উপায় না থাকলে তখন উপরোক্ত উত্তম পন্থায়ই এ কাজ করা যেতে পারে। কিন্তু কেউ যদি এক সাথে তিন তালাক দিয়ে বসে তবে তাতেও তালাক কার্যকর হবে সত্য, তবে তা হচ্ছে সমস্ত উম্মতের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট পন্থা। কেউ কেউ একে নাজায়েযও বলেছেন। এতে তিন তালাকই হয়ে যাবে এবং তালাক প্রত্যাহার তো দূরের কথা বিবাহ নবায়ন করার সুযোগটুকুও আর থাকবে না। মাওলানা আবু যাহেদ সরফরাজ তাঁর "উমদাতুল আসার" গ্রন্থে এ মাসআলা বিষদভাবে উল্লেখ করেছেন।

মাহমুদ ইবনে লবীদের ঘটনা নাসাঈর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিন তালাক এক সাথে দেয়াতে হুজুর খুব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এমনকি কোনো কোনো সাহাবী তাকে হত্যার যোগ্য বলেও মনে করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হুজুর একে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক ঘোষণা করার কোনো বর্ণনা কোথায়ও পাওয়া যায়নি।–(মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)–মাআরেফুল কুরআন)

[অধিক জানার জন্যে ফিক্‌হর কিতাবসমূহের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় দেখা যেতে পারে।]

পুনর্বিবাহের একটি ঘৃণ্যতম ও অভিশপ্ত পন্থা

স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর তাকে পুন গ্রহণ করার একটি কঠিন পথ হলো দ্বিতীয় স্বামী ঐ মহিলাকে স্বেচ্ছায় তালাক দেয়ার পর ইদ্দত সমাপান্তে প্রথম

স্বামী তাকে পুন বিবাহ করা। শরীয়তের পরিভাষায় যা হাল্লালা বা হীলা নামে পরিচিত। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে কোনো ষড়যন্ত্র কিংবা কোনো পূর্বশর্ত আরোপ সম্পূর্ণ হারাম। কেউ যদি তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে পুন হালাল করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র কিংবা পূর্ব প্রস্তুতি সহকারে অথবা তালাক দেয়ার শর্ত আরোপ করে অন্য কারো কাছে বিবাহ দেয় তবে তা সম্পূর্ণ না-জায়েয হবে। তাদের বিবাহ ও তালাক দু'টোই হতে হবে স্বাভাবিক নিয়মে। হাল্লালার জন্যে কেউ বিবাহ করলেও তালাক দিলে উভয়ই গুনাহগার ও অভিশপ্ত হবে। হযরত ওমর (রা) বলেন, যে নারী-পুরুষ হাল্লালার শর্তে বিয়ে করবে আমি এরূপ স্বামী-স্ত্রীকে রজম (পাথর নিক্ষেপ) করে ছাড়বো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ হাল্লালাকারী ও যার জন্যে হাল্লালা করা হয়েছে উভয়কে কঠোর লা'নত করেছেন।

মূলতঃ শর্তারোপ, চাপ প্রয়োগ, ষড়যন্ত্র যে কোনোভাবে হাল্লালার জন্যে বিবাহ দিলে তাকে বিবাহই বলা যাবে না। বরং এতে ব্যভিচারই হবে। তাই এরূপ বিবাহ ও তালাক দ্বারা স্ত্রীলোকটি প্রথম স্বামীর জন্যে কিছুতেই হালাল হবে না।–(সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী–তাফহীমুল কুরআন ও মুজীবুল্লাহ নদভী–ইসলামী ফিক্‌হ)

সতের

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ص وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا ز (البقرة : ٢٣١)

"যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও, তারপর তারা নির্ধারিত ইদ্দত শেষ করে নেয়। তখন তোমরা হয়ত নিয়মানুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও, না হয় সহানুভূতির সাথে মুক্ত করে দাও। তোমরা তাদের জ্বালাতন করার উদ্দেশ্যে রেখে দিয়ে বাড়াবাড়ী করো না। আর যে ব্যাক্তি এমনটি করবে সে অবশ্য তার নিজের উপরই যুলুম করবে। আল্লাহর বাণীকে তামাশার বিষয়ে পরিণত করো না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩১)

স্ত্রীকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ বন্ধনে আটকে রাখা নিষেধ

তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যখন ইদ্দত অতিক্রম করার কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তখন স্বামীর দু'টো অধিকার থাকে। একটি হচ্ছে তালাক প্রত্যাহার করে বিবাহ বন্ধনে রেখে দেয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে তালাক প্রত্যাহার না করে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা। এ দু'টি অধিকার বা ভূমিকা পালনে সে মুক্ত নয়, বরং কুরআন এ ক্ষেত্রে উভয় অবস্থায়ই শর্ত আরোপ করেছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা "বিল-মারূফ" শব্দ প্রয়োগ করে উভয় অবস্থাতেই শর্ত ও নিয়ম-নীতি অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। উভয় অবস্থায় যেটাই করা হোক তা করতে হবে শরীয়তের নিয়মানুযায়ী। কেবল সাময়িক খেয়াল খুশী বা আবেগের তাগিদে কোনো কিছু করা চলবে না।

যেমন তালাক দেয়ার পর বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহতা ও পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে যদি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে বিয়েতে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তবে সে জন্যে শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে মনোমালিন্যতাকে অন্তর থেকে ধুয়ে মুছে সুন্দর সুখী জীবন-যাপন এবং পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে

আদায় করার মনোভাব থাকতে হবে। স্ত্রীকে যন্ত্রণা ও কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তা করা যাবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, লোকেরা তাদের স্ত্রীদের হাস্যচ্ছলে তালাক দিতো, আসলে তাদের অন্তরে তালাক দেয়ার নিয়ত রাখতো না। অতপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন, وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا "তোমরা আল্লাহর আয়াত নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করো না।" আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে হযরত ইবাদাহ ইবনে সামিত (রা) উপরোক্ত আয়াতের প্রসংগ লিপিবদ্ধ করেছেন। তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় লোকেরা একে অপরকে বলতো, আমি তোমার বোনকে বিবাহ করলাম। কিন্তু পরে বলতো, তা তো তামাশা করে বলেছিলাম। আবার কেউ কেউ বলতো তোমাকে আযাদ করে দিলাম। পরে বলতো তাতো হাসি-ঠাট্টা করে বলেছিলাম। তারপর আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ ثَلٰثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ তিনটি বিষয় এমন আছে যেগুলো ইচ্ছা করে বলা আর হাসি তামাশা করে বলা সমান। (১) বিবাহ, (২) তালাক ও (৩) রাজয়াত বা তালাক প্রত্যাহার। সুতরাং দু'জন স্ত্রী ও পুরুষ বিয়ের ইচ্ছা ছাড়াও যদি হাসতে হাসতে ইজাব কবুল করে নেয়, তবে বিবাহ হয়ে যাবে। তেমনিভাবে তালাক তালাক প্রত্যাহার ও দাস মুক্তির ব্যাপারেও একই বিধান।-(মাআরেফুল কুরআন)

আঠার

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

"যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও, তারপর তারা নির্ধারিত ইদ্দত পালন করে, তখন তাদের পূর্ব স্বামীর সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধা দান করো না। এ উপদেশ তাদেরকে দেয়া যাচ্ছে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে বিশ্বাস করে। তোমাদের জন্যে এতে রয়েছে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। আল্লাহ (তোমাদের পবিত্রতা ও মঙ্গল) ভালভাবেই জানেন, তোমরা তা জান না।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩২)

অভিভাবক বা পূর্ব স্বামী মহিলার নির্বাচিত স্বামী গ্রহণে বাধা দিতে পারবে না

কোনো স্ত্রীলোককে তার স্বামী যদি তালাক দেয় এবং ইদ্দত পালনের মধ্যে তাকে ফিরিয়ে না লয় এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর উভয়ই যদি পুনর্বিবাহিত হতে রাজি হয়, তবে স্ত্রীলোকটির অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজনগণ এ কাজে তাকে বাধা দেয়া উচিত নয়। আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, স্ত্রী ইদ্দত পালন শেষ করে পূর্ব স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পর যদি অন্য কোনো স্থানে নিজের বিবাহ ঠিক করতে চায়, তখন পূর্ব স্বামীর পক্ষে এটা কিছুতেই উচিত হবে না যে, সে ঐ মহিলার দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধ করে রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

উপরোক্ত আয়াতের শানেনুযুল বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা মুফতী শফী (র) বুখারী শরীফের একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার তাঁর বোনকে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। সে ব্যক্তি তাকে তালাক দেয় এবং পরে কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তাকে পুনরায় বিবাহ করতে মনস্থ করে। তার তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীও তাতে সম্মত হয়। কিন্তু যখন লোকটি এ প্রস্তাব মা'কালের নিকট পেশ করে, তখন তিনি যেহেতু তালাক

দেয়াতে তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাই তিনি উত্তর দিলেন, আমি তোমাকে সম্মান করেই তোমার নিকট আমার বোনকে বিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি সে সম্মানের মূল্য না দিয়ে তাকে তালাক দিয়ে দিলে। এখন তাকে পুনরায় বিয়ে করতে চাইছো ! জেনে রেখ, আল্লাহর কসম সে আর তোমার বিবাহাধীন যাবে না।

সাহাবীগণ আল্লাহ ও রাসূলের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। আয়াত শোনা মাত্রই হযরত মা'কালের সমস্ত ক্রোধ পড়ে যায় এবং তিনি স্বয়ং ঐ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে বোনের পুনর্বিবাহ তারই সাথে দিয়ে দেন। আর কসমের কাফ্ফারাও আদায় করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, কোনো মহিলার পসন্দমত ব্যক্তির সাথে বিয়ের বাধা সৃষ্টি করা যাবে না তখন ; যদি তাদের সম্মতিটা হয় শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে। অন্যথায় বাধাদান বরং শক্তি প্রয়োগও উচিত হবে। যেমন, বিয়ে ছাড়াই পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করতে শুরু করলে, তিন তালাকের পর অন্যত্র বিয়ে ছাড়াই যদি পুনর্বিবাহ করতে চায়, অথবা ইদ্দতের মধ্যেই অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন সকল মুসলমানের বিশেষত তাদের সাথে সম্পর্কিত লোকদের সম্মিলিতভাবে বাধা দিবে ও প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে তা প্রতিহত করবে। তেমনিভাবে কোনো মেয়ে যদি স্বীয় অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কুফু হীনতার স্থানে বা বংশের প্রচলিত মোহরের কমে বিয়ে করতে চায় যাতে এর কুপ্রভাব বংশের উপর পড়তে পারে, তবে এমন ক্ষেত্রেও তারা বাধা প্রদান করতে পারে।

এটা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসীদের জন্য গ্রহণীয় উপদেশ বলার অর্থ, ঈমানদারদের এর ব্যতিক্রম করা বা এতে শিথিলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়।

এ উপদেশ সম্বলিত নির্দেশের ব্যতিক্রম করা পাপ মগ্নতা ও ফিতনা ফাসাদের কারণ হতে পারে। কারণ প্রাপ্তবয়স্কা বুদ্ধিমতি যুবতী মেয়েকে সাধারণভাবে বিয়ে থেকে বিরত রাখা একদিকে তার প্রতি অত্যাচার করা, তাকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ; অপরদিকে তার সতিত্ব পবিত্রতা ও মান-ইজ্জতকে আশংকায় ফেলে রাখার নামান্তর।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, পবিত্রতা ও কল্যাণ সম্পর্কে আল্লাহই সম্যক অবগত আছেন। মানুষ তার ভবিষ্যত কল্যাণ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। সুতরাং মানুষ আল্লাহর নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করার মধ্যে তার ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

—(মাআরেফুল কুরআন, তাফহীমুল কুরআন ও তাফসীরে ইবনে কাসীর)

উনিশ

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُوْدِلَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط لاَتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا ج وَلاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ق (البقرة : ٢٣٣)

"সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বছর দুধ খাওয়াবে, যারা দুধ খাওয়ানোর মুদ্দত পূর্ণ করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী পিতার দায়িত্ব হলো নারীকে যথারীতি খোরপোষের ব্যবস্থা করা। কাউকেও তার সামর্থের অধিক চাপ দেয়া যাবে না। সন্তানের জন্যে না জননীকে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে, না পিতাকে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩)

শিশুকে দুধ খাওয়াবে মাতা, আর মাতার ভরণ-পোষণ দিবে পিতা

আয়াতের প্রথমাংশে শিশুদের দুধ পান করানোর মেয়াদ সম্পর্কিত হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। অধিকাংশ ইমামের মতে দুধ খাওয়ানোর মেয়াদ দু' বছর। ইমাম মালিক (র) থেকে দু'টো বর্ণনা পাওয়া যায়। একটিতে দু' বছর দু' মাস, আরেকটি হলো দু' বছর তিন মাস। ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে এর মেয়াদ হলো দু' বছর ছয় মাস। এ ব্যাপারে ফিক্‌হের কিতাব দেখে বিস্তারিত জ্ঞান হাসিল করা যেতে পারে। [বর্তমানে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর বাংলা ভাষায় অনুদিত তিনটি কিতাব আছে। (১) বেহেশতী জেওর। (২) আসান ফিকাহ (৩) ইসলামী ফিকাহ। তাছাড়া হেদায়া এবং ফতোয়ায়ে আলমগীরীও বাংলায় অনুদিত হয়েছে।]

প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত আয়াতে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর সন্তামের দুধ পান করানো সম্পর্কিত হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। মাআরেফুল কুরআন ও তাফহীমুল কুরআনে এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। শিশুকে দুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব মাতার উপর আর মাতার ভরণ-পোষণ ও জীবন ধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করা পিতার দায়িত্ব। এ হুকুম প্রযোজ্য হবে যখন স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ সম্পর্ক ঠিক থাকবে অথবা তালাক পরবর্তী ইদ্দতের মধ্যে থাকবে।

কিন্তু তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে ভরণ পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য। তবে শিশুকে দুধ খাওয়ানোর পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। কারণ শিশুর মালিক পিতা।

এ ক্ষেত্রে স্বামীর সামর্থ ও স্ত্রীর মর্যাদার বিবেচনা

স্বামী-স্ত্রী উভয়ই যদি ধনী হয় তবে ভরণ-পোষণও হবে ধনীদের ষ্টাণ্ডারে। আর দু'জনই গরীব হলে ভরণ-পোষণও হবে গরীবদেরই মানে। আর যদি দু'জনের অবস্থা এক রকম না হয় তবে ভরণ-পোষণের মান নির্ধারণে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হেদায়া প্রণেতা বলেছেন, যদি পুরুষ ধনী হয় আর স্ত্রী গরীব হয়, তবে এমন মানের খোরপোষ দিতে হবে যা দরিদ্রদের চেয়ে বেশী ও ধনীদের চেয়ে কম মানের হয়। ইমাম কারখীর মতে স্বামীর আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে মান নির্ণিত হবে।

উৎস ঃ –তাফসীর ইবনে কাসীর।
–তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন।
–তাফহীমুল কুরআন।

বিশ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ج فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○ (البقرة : ٢٣٤)

"আর তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় এবং তাদের স্ত্রীদের রেখে যায়। তবে তারা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন (বিবাহ থেকে) বিরত রাখবে। যখন তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে তখন নিজের ব্যাপারে নীতি সংগত ব্যবস্থা নিতে কোনো দোষ বা গুনাহ নেই। আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কারবারের ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন।"

-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৪)

সহবাসের পূর্বেও যদি স্বামী মারা যায় তবুও স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে

যেসব স্ত্রীলোকের বিবাহের পর স্বামীর সাথে নির্জনবাস সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই স্বামী মারা গেছে, স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদ্দত তাদেরও পালন করতে হবে। আয়াতে يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ "নিজেদেরকে বিরত রাখতে হবে"-এর অর্থ কেবল এটাই নয় যে, এ সময়ে বিবাহ করবে না। বরং সেই সাথে নিজেকে সকল প্রকার অলংকার ও সাজগোজ থেকেও বিরত রাখতে হবে। হাদীস শরীফে স্পষ্ট ভাষায় সে সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং ইদ্দত পালনকালে স্ত্রীদের রঙ্গীন পোশাক, অলংকার সুরমা, সুগন্ধি, মেহেদী ও খেজাব ব্যবহার না করতে এবং কেশ বিন্যাস থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

অবশ্য এ সময় স্ত্রীদের ঘর থেকে বাইরে যাওয়া সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে। হযরত ওমর (রা), উসমান (রা), ইবনে ওমর (রা), যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) প্রমুখ সহ বারো ইমাম এ মত প্রকাশ করেছেন যে, যেই ঘরে স্বামী মারা গেল, তার বিধবা স্ত্রী সে ঘরেই ইদ্দত পালন করবে। অবশ্য তখনও দিনের বেলায় প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারবে। কিন্তু সে ঘরেই তাকে বসবাস করতে হবে। পক্ষান্তরে হযরত আলী (রা),

হযরত আয়েশা (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখের মতে স্ত্রীলোকটি যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করতে পারবে এবং প্রয়োজনে দেশান্তরেও গমন করতে পারবে।-(তাফহীমুল কুরআন)

ইদ্দত সংক্রান্ত কতিপয় হুকুম ঃ ১. স্বামী মারা গেলে ইদ্দতের মধ্যে সুগন্ধি ব্যবহার, সাজ-সজ্জা, সুরমা-তৈল ব্যবহার নিষ্প্রয়োজনে ঔষধ সেবন করা, অলংকার ব্যবহার করা, রঙিন কাপড় পরিধান করা জায়েয নয়। বিয়ের জন্য আলোচনা করাও দুরস্ত নেই। রাতে অন্য ঘরে থাকাও জায়েয নেই। যে স্ত্রীলোক বায়েন তালাক প্রাপ্তা অর্থাৎ যার তালাক প্রত্যাহারযোগ্য নয়, তাদের ক্ষেত্রে স্বামী গৃহে ইদ্দত পালনকালে দিনের বেলায় অতি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়াও সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। ২. চাঁদ রাতে যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, তবে এ মাসটি ৩০ দিনের হোক অথবা ২৯ দিনের হোক অবশিষ্ট চাঁদের হিসেবেই ইদ্দত পূরণ করতে হবে। আর যদি চাঁদ রাতের পরে মৃত্যু হয় তবে প্রত্যেক ৩০ দিনে এক মাস ধরে ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। তাতে মোট ১৩০ দিন পূর্ণ হবে। এ সময় অতিবাহিত হয়ে যখন মৃত্যুর তারিখটি ঘুরে আসবে তখনই ইদ্দত শেষ হবে। আর কেউ যদি শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করে, তবে অন্যকেও সাধ্যানুযায়ী বাধা দেয়া ওয়াজিব। কেউ যদি বাধা না দেয় তবে তারাও গুনাহগার হবে।-(মাআরেফুল কুরআন)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) জিজ্ঞাসিত হন যে, একটি লোক বিবাহ করার পর স্ত্রীর সাথে সহবাস হওয়ার আগেই সে মারা যায়। তার জন্য কোনো মোহরও ধার্য হয়নি। এ স্ত্রীলোকটির ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হবে ? তারা কয়েকবার তাঁর কাছে যাওয়ার পর তিনি বলেন, এর সিদ্ধান্ত আমি আমার নিজের মতানুসারে দিচ্ছি। ঠিক হলে বুঝবে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে আর ভুল হলে বুঝবে আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে—এ ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূল তা থেকে পবিত্র। শোন ! সে স্ত্রীকে পূর্ণ মোহর দিতে হবে। তবে এটা স্বামীর আর্থিক অবস্থার উপর বিবেচ্য। এতে কোনো রকম বেশকম করা যাবে না। স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে। আর সে স্বামীর উত্তরাধিকারীও হবে। এটা শুনে মা'কাল ইবনে ইয়াসার আল-আশজায়ী (রা) উঠে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারু বিনতে ওয়াশিক সম্পর্কেও এরূপ ফায়সালা দিতে শুনেছি। এটা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) খুব খুশী হলেন।

তবে স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে এ হুকুম নয়। কারণ, তার ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত সময়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে

বর্ণিত আছে, গর্ভবতীর ইদ্দত হলো সন্তান প্রসবের পর আরও ৪ মাস ১০ দিন। তাই সবচেয়ে দীর্ঘ ও প্রলম্বিত ইদ্দত হচ্ছে গর্ভবতীদের ইদ্দত। এ বর্ণনাটি বেশ উত্তম এবং শক্তিশালীও বটে। মুহাম্মদ ইবনে সহ বহু আলিম এবং আহলে যাহেরদের অনেকের মতে এ আয়াত দ্বারা আযাদ ও দাসীদের ইদ্দতকাল সমান বলে প্রমাণিত। কেননা ইদ্দত একটি হুকুম আর তা সকল মানুষের বেলায় সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু জমহুর উলামার মতে আযাদ মহিলা থেকে দাসীদের হুকুম ভিন্ন। তাদের ইদ্দত হচ্ছে আযাদ মহিলাদের অর্ধেক অর্থাৎ দু' মাস পাঁচ দিন। দাসীদের শাস্তি যেমন আযাদের অর্ধেক তাদের ইদ্দতও অর্ধেক।–(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

একুশ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ط عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ط وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ط

"আর তোমরা যদি (বিধবাদের) ইদ্দত পালনকালে সেই নারীদের বিবাহ করার ইচ্ছা ইশারা-ইংগিতে প্রকাশ কর অথবা তা মনের মাঝে লুকিয়ে রাখ, তবে উভয় অবস্থায় তা দোষের কাজ নয়। আল্লাহ জানেন তাদের কথা তোমাদের মনে জাগবেই। কিন্তু সাবধান ! তাদের সাথে গোপনে কোনো চুক্তি-প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না। তবে হ্যাঁ, কিছু বলতে হলে প্রথানুসারে বিধিসম্মতভাবে বলবে। আর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনের সিদ্ধান্ত নিবে না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৫)

ইশারা-ইংগিতে বিধবাদের বিবাহ পয়গাম জায়েয কিন্তু গোপনে বিবাহ-চুক্তি বৈধ নয়

আলোচ্য আয়াতে ইদ্দত পালনরত বিধবাদের ইশারা-ইংগিতে বিবাহ প্রস্তাব প্রদান সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ ধরনের প্রস্তাব জায়েয হলেও বিবাহ কার্যের গোপন চুক্তি জায়েয নয় এবং ইদ্দতের মধ্যে যথারীতি প্রকাশ্যে প্রস্তাব দিয়েও বিবাহ জায়েয নয়। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর ইসলামী শরীয়তের নিয়ম-রীতি অনুযায়ী বিবাহ কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে। সকল ইমামের এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে বিবাহ শুদ্ধ নয়।

মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রীকে অস্পষ্ট ভাষায় বিবাহের প্রস্তাব দেয়া জায়েয আছে। তেমনিভাবে তালাক প্রাপ্তাকেও এভাবে বিবাহ প্রস্তাব দেয়া বৈধ।

এ প্রসংগে তাফসীরে ইবনে কাসীরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা)-কে যখন তার স্বামী আবু আমর ইবনে হাফ্স (রা) তৃতীয় তালাক দিয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন,

তুমি ইবনে মাকতুমের ঘরে ইদ্দত পালন কর। তিনি আরো বললেন, ইদ্দত পালন শেষ হলে আমাকে জানাবে। অতপর ইদ্দত পালন শেষ হলে উসামা ইবনে যায়েদ (রা) তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং উসামার সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়।-(ইবনে কাসীর)

এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, উপরিউক্ত বিধানাবলী হলো বিধবা অথবা বায়েন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ব্যাপারে। সুতরাং তালাকে রাজঈর ইদ্দত চলাকালে স্বামী ছাড়া অন্য কারো জন্যে পয়গাম দেয়া জায়েয নয়।

উৎস ঃ -তাফসীর ইবনে কাসীর।
-তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন।
-তাফহীমুল কুরআন।

বাইশ

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ج وَمَتِّعُوْهُنَّ ج عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ج مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ج حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ○(البقرة : ٢٣٦)

"তোমরা নিজ স্ত্রীদের স্পর্শ করার পূর্বে অথবা তাদের মোহরানা নির্ধারণ করার পূর্বে যদি তাদের তালাক দাও তাতে তোমাদের দোষ নেই। তবে তাদের কিছু দিয়ে দিতে হবে। সচ্ছল ব্যক্তি তার সামর্থানুয়ায়ী এবং দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থানুযায়ী ন্যায়সংগতভাবে অবশ্যই আদায় করবে। এটা মুহসিনদের (পুণ্যবানদের) উপর আরোপিত বিশেষ দায়িত্ব।"

-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৬)

স্ত্রীকে স্পর্শ না করলেও এবং মোহরানা ধার্য না হলেও তাকে তালাক দিলে অবশ্যই কিছু সম্পদ দিতে হবে

আলোচ্য আয়াতে বিয়ে ও তালাক সম্পর্কিত একটি বিধান বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে বিয়ের আক্‌দ হয়েছে ঠিক কিন্তু আক্‌দ হওয়ার সময় মোহর নির্ধারণ করা হয়নি। এমতাবস্থায় যদি স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাস হওয়ার পূর্বেই তালাক হয়ে যায় তবে ঐ স্ত্রীকে মোহর দেয়া ওয়াজিব নয়। কিন্তু তবুও সামর্থানুযায়ী ঐ স্ত্রীকে অবশ্যই কিছু সম্পদ দিতে হবে। নেক্‌কার লোকদের উপর সামর্থ অনুসারে কিছু সম্পদ তাকে দিয়ে দেয়া ওয়াজিব। কতটুকু সম্পদ দিতে হবে কুরআন মজীদ তা নির্ধারণ করে দেয়নি। বরং তা লোকদের শিষ্টাচার ও ঈমানী মর্যাদার উপর ছেড়ে দিয়ে এতটুকু সীমা বলে দিয়েছে যে, ধনী ব্যক্তি তার আর্থিক সংগতি অনুযায়ী আর দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থ অনুযায়ী কিছু দিয়ে দেবে।

এ ব্যাপারে মুসলিম সমাজের ঐতিহাসিক ও ব্যবহারিক কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত হাসান (রা) এমনি ব্যাপারে বিশ হাজারের উপঢৌকন দিয়েছিলেন। কাজী শোরাইহ পাঁচ শত দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দিয়েছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে একজোড়া কাপড়।-(কুরতুবী-মাআরেফুল কুরআন)

ইসলামী শরীয়ত নারীদের ইজ্জত সম্ভ্রমের যে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং যা ইসলামী সমাজ ছাড়া আর কোথায়ও নেই তারই একটা ন্যূনতম নিদর্শন হচ্ছে উপরিউক্ত বিধান। নারীর সাথে কেবল বিয়ের শরীয়তসম্মত চুক্তি বা আক্‌দ হওয়ার কারণেই তাকে কিছু সম্পদ দিতে হবে। তার সাথে বিয়ে উত্তর দৈহিক সম্পর্ক না হলেও এবং বিয়ের সময় মোহর ধার্য না হয়ে থাকলেও ইসলামী শরীয়তের এ নির্দেশ। কারণ, সম্পর্ক স্থাপনের পর তা ছিন্ন করলে স্ত্রীগণ কিছু না কিছু ক্ষতিগ্রস্ত অবশ্যই হয়ে থাকে। তাই সামর্থানুসারে সে ক্ষতিপূরণের জন্য আল্লাহর এ নির্দেশ।–(তাফহীমুল কুরআন)

আর যদি আক্‌দ হওয়ার সময় মোহর নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এবং নির্জনবাসের পূর্বেই তালাক সংঘটিত হয়। তবে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক দেয়া ওয়াজিব। অবশ্য স্ত্রী যদি ক্ষমা করে দেয় অথবা স্বামী যদি সম্পূর্ণ মোহর দিয়ে দেয়, তবে তা তাদের বদান্যতা। অবশ্য ক্ষমা করার বিষয়টি বর্তমানে অত্যন্ত জটিল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। স্ত্রীর ক্ষমা করে দেয়াটা কোনো চাপে পড়ে অথবা আবেগে আতিসহ্যে কিনা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। স্ত্রী সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ক্ষমা করলে তবেই তা ক্ষমা হিসেবে গণ্য হতে পারে, অন্যথায় নয়।

আমাদের সমাজে 'মোহর' মাফ করে দেয়ার বিষয়টি স্ত্রীর সাথে সম্পৃক্ত বলে মনে করা হয়। উপরিউক্ত অবস্থায় স্বামীর পক্ষ থেকেও ক্ষমা হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পুরুষের পূর্ণ মোহর দিয়ে দেয়াকেও মাফ করে দেয়া বলা হয়েছে হয়তো এজন্যে যে, আরব দেশে সাধারণ প্রথানুযায়ী বিয়ের সংগে সংগেই মোহর দিয়ে দেয়া হতো। সুতরাং সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে প্রদত্ত মোহরের অর্ধেক স্বামীর প্রাপ্য হয়ে যেতো। কাজেই সে যদি এই অর্ধেক না নেয়, তবে তাও ক্ষমার পর্যায়ে পড়ে। ক্ষমা বা মাফ করা উত্তম ও তাক্‌ওয়ার অনুকূল। কেননা তালাক যে ভদ্রোচিত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এ ক্ষমা তারই নিদর্শন—যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে উত্তম ও সওয়াবের কাজ। সুতরাং ক্ষমা স্ত্রীর পক্ষ থেকেও হতে পারে আর তা হতে পারে স্বামীর পক্ষ থেকেও।–(মাআরেফুল কুরআন)

তেইশ

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى -

"আর তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জনকে সাক্ষী বানাও। যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে সাক্ষী বানাবে। অবশ্য সাক্ষীরা হবে এমন যাদের সাক্ষ্যদানে তোমরা বিশ্বাস রাখতে পার। মহিলা দু'জনের একজন যদি ভুলে যায় তবে যেন অপরজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২)

নারীরাও সাক্ষী হিসেবে গণ্য

আলোচ্য আয়াতাংশে লেনদেনে দলীল লেখা ও লেখানোর জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত করা হয়েছে। ইসলামে লেনদেনে দলীল সম্পাদনার সাথে সাথে সাক্ষ্য রাখার জন্যে বিধান দেয়া হয়েছে। যেন কখনো কোনো পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে আদালতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফায়সালা করা যেতে পারে। কিন্তু ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণের মতে কেবল লেখা শরীয়ত সম্মত প্রমাণ নয় সাথে সাথে সাক্ষীও থাকতে হবে। সাক্ষী ছাড়া কেবল লেখার উপর ভিত্তি করে বিচার ফায়সালা করা শরীয়তসম্মত নয়।

শরীয়ত সাক্ষীর সংখ্যাও নির্ধারণ করে দিয়েছে, সমাজে গ্রহণযোগ্য দু'জন মুসলমান পুরুষ সাক্ষী থাকতে হবে। যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তবে অন্ততঃ একজন পুরুষ ও দু'জন নারীকে সাক্ষ বানাতে হবে। যাতে করে একজন নারী বিষয়টি ভুলে গেলে অপরজন তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে সাক্ষ্য গ্রহণের কতিপয় জরুরী নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ

(১) সাক্ষীর সংখ্যা হবে দু'জন পুরুষ। (২) সাক্ষীদ্বয় মুসলিম হতে হবে। (৩) দু'জন পুরুষ না পেলে অন্ততঃ একজন পুরুষ ও দু'জন নারী সাক্ষী হবে। (৪) সাক্ষী করতে হবে এমন সব লোককে যারা নিজেদের নৈতিক চরিত্র ও বিশ্বস্ততার কারণে লোক সমাজে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত। (৫) একা একজন পুরুষ অথবা কেবল দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষীর জন্য যথেষ্ট নয়।

চব্বিশ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে পৃথিবী ও আকাশের কোনো কিছুই গোপন নেই। তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে যেমন ইচ্ছা আকৃতিদান করেন। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তিনি প্রবল পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৫-৬)

মাতৃগর্ভে আল্লাহই নিজের ইচ্ছানুযায়ী মানুষের আকৃতি গঠন করেন

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহর সর্বশক্তিমান হওয়ার বিষয় বর্ণনা প্রসংগে মানব সৃষ্টির ব্যাপারে তার সৃষ্টি নৈপুণ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি মানুষকে মায়ের উদরে তিনটি অন্ধকার পর্যায়ে অত্যন্ত সুনিপুণতার সাথে সৃষ্টি করেন। মানুষের আকার-আকৃতি ও বর্ণনা বিন্যাসে তিনি এমন সুদক্ষ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন যা মানুষের ধারণার অতীত। একই অংগ-প্রত্যঙ্গ হলেও একজনের সাথে অন্যজনের মিল নেই। সর্বাংগে সামগ্রিক মিলের কোনো দু'জন মানুষ কোথায়ও পাওয়া যাবে না।

কোনো মানব সন্তান মাতা-পিতার ইচ্ছায় যেমন জন্মগ্রহণ করে না তেমনি আকার-আকৃতিতেও মাতা-পিতার কোনো হাত নেই। নারী জাতির উদর থেকে আল্লাহ নিজ ক্ষমতায় ও স্ব-ইচ্ছায় মানব জাতির রূপরেখা, স্বভাব-চরিত্র, স্থায়িত্ব, আয়ু ইত্যাদি নির্ধারণ করে থাকেন। অতএব যার হাতে এসব কিছুই নিবন্ধ একমাত্র তিনিই মানব জাতির ইলাহ মাবুদ হওয়ার যোগ্য। অন্য আয়াতে রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন। তিনি কাউকে ছেলে দান করেন কাউকে দিয়ে থাকেন মেয়ে, আর কাউকে রাখেন আকীম অর্থাৎ বন্ধা—নিঃসন্তান। আবার তিনি কাউকে দু' ধরনের সন্তান—ছেলে ও মেয়ে উভয়টিই দিয়ে থাকেন।

যদিও মাতা-পিতার যৌন মিলনের ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে কিন্তু এমন অনেক দম্পতি আছেন যারা শেষ বয়সে উপনীত হয়েও কোনো সন্তান লাভে সক্ষম হন না। অনেকে অনেক চেষ্টা-তদবীর করেও সন্তান লাভ করতে পারেন না। অথচ অনেক দম্পতি এমন আছে তারা আর সন্তান কামনা করে না—জন্ম নিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীর অজান্তে গর্ভে সন্তান এসে গেছে। মোটকথা সন্তান হওয়া না হওয়ার মূল চাবিকাঠি রাব্বুল আলামীনের কুদরতি হাতে।

পঁচিশ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○ (ال عمران : ١٤)

"মানুষের জন্যে আকর্ষণীয় করা হয়েছে নারী, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রূপার স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, গবাদি পশু ও কৃষি ভূমি। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর একমাত্র আল্লাহরই কাছে রয়েছে উত্তম আশ্রয়।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪)

পার্থিব নেয়ামতসমূহের মধ্যে নারীর স্থান শীর্ষে

আলোচ্য আয়াতে দুনিয়ার ছয়টি প্রধান নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) নারী, (২) সন্তানাদি, (৩) সোনা-রূপার ভাণ্ডার, (৪) উৎকৃষ্ট ঘোড়া (বাহন), (৫) গৃহপালিত জন্তু, (৬) শষ্য ক্ষেত। এসব উল্লেখযোগ্য প্রধান নেয়ামতসমূহের মধ্যে নারী হচ্ছে শীর্ষস্থানীয়। হাদীস শরীফের ভাষায় خَيْرُ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ অর্থাৎ "মানুষ যাকিছু সঞ্চয় করে তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে সতী নারী।"

নারীর সতীত্বের ব্যাখ্যায় হাদীস শরীফে বলা হয়েছে—"স্বামী যখন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তখন সে তাকে সুখী করে, তাকে কোনো আদেশ করলে সে আনুগত্য স্বীকার করে, তাকে ঘরে রেখে গেলে সে নিজের পবিত্রতা রক্ষা করে ও স্বামীর ধন-সম্পদের হেফাজত করে।" অন্য এক হাদীসে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার কাছে নারী ও সুগন্ধি খুবই প্রিয় বস্তু। তবে নামাযে আমার হৃদয় মনে প্রশান্তি আসে।"

মানুষকে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর দেয়া উক্ত ছয়টি নেয়ামতের মধ্যে সর্বপ্রথম ও প্রধান হলো নারী। বাকীগুলো মূলতঃ নারীকে কেন্দ্র করেই এবং নারীর কারণেই। আল্লাহ তা'আলা মানুষের মনে এসব নেয়ামতের প্রতি স্বভাবগতভাবেই আশক্তি ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। মানব স্বভাবের মধ্যে এসবের আশক্তি সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ তা'আলার অনেক রহস্য বিদ্যমান

রয়েছে। যেমন, (১) এসবের প্রতি আশক্তি ও আকর্ষণ না থাকলে পৃথিবীর সমস্ত ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে যেত। মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি করে পাঠানোর কোনো মূল্য হতো না আর পৃথিবী বে-আবাদ হয়ে পড়তো। (২) মানুষের মনে জাগতিক নেয়ামতের প্রতি আশক্তি ও ভালবাসা না থাকলে তারা পরকালীন প্রশান্তি কামনার্থে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ হতো না এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার মানসিকতা অর্জন করতে পারতো না। (৩) এসব আকর্ষণীয় নেয়ামতের প্রতি মানুষের অন্তরে ভালবাসা ও আশক্তি সৃষ্টি করে মূলত তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে। আল্লাহ্ দেখতে চান কারা এসবের মধ্যে ডুবে থেকেও আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়ার কথা স্মরণ রেখে এগুলোকে আল্লাহর দেয়া সীমারেখার মধ্যে রেখে ব্যবহার করে ও নির্ধারিত গণ্ডীর মধ্য থেকে নশ্বর দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন অতিবাহিত করে। পক্ষান্তরে কারা দুনিয়ার এসব চাকচিক্য ও তাল-তামাশার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে নিয়ন্ত্রণবিহীন জীবনযাপন করে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝

"আমি পৃথিবীর সমস্ত বস্তু পৃথিবীর সৌন্দর্যের জন্যে সৃষ্টি করেছি। যাতে তাদের মধ্যে কে সৎকাজ করে তা পরীক্ষা করে দেখতে পারি।"

-(সূরা আল কাহাফ ঃ ৭)

পৃথিবীতে যেসব বস্তুকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের চোখে সুশোভিত করে দিয়েছেন শরীয়তসম্মত পন্থায় সেগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমিত উপার্জন ও যথাবিধি ব্যবহার করলে উভয় জাহানেই সাফল্য নিশ্চিত। পক্ষান্তরে ওসব বস্তু অবৈধ পন্থায় উপার্জন ও ব্যবহার করলে সামগ্রিক ধ্বংস অনিবার্য।

উদাহরণ স্বরূপ প্রধান আশক্তির বস্তু হিসেবে নারীকে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। নারীর প্রতি আশক্তি পুরুষের স্বভাবজাত কামনা বাসনা আল্লাহ নিজেই সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যার মূলে রয়েছে পৃথিবীর সামগ্রিক শৃংখলা ও সৌন্দর্য রক্ষা ও বিশ্বের উৎকর্ষ সাধনের নিয়ামক স্বরূপ ভূমিকা রাখা। এখন কেউ যদি এ কামনা বাসনাকে বিধি বহির্ভূত পন্থায় ও শরীয়ত বিরোধী উপায়ে ব্যবহার করে সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে দেয়ার পরিবেশ সৃষ্টিতে মত্ত হয়ে পড়ে তবে তাদের আল্লাহ্ স্বয়ং তা থেকে প্রতিহত করবেন না। আল্লাহ্ তো তাদের একদিকে হক-বাতিল, ভাল-মন্দ, নেক-বদ ইত্যাদির পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন অন্যদিকে মানুষকে দিয়েছে ইচ্ছার স্বাধীনতা। কর্মের স্বাধীনতা নির্বাচন স্বাধীনতা। আল্লাহ্ পরীক্ষা করছেন মানুষ এসব স্বাধীনতা কিভাবে ভোগ করে।

নর-নারীর পারস্পরিক যৌন সম্পর্ক যখন নিয়ন্ত্রণহীনভাবে পরিচালিত হয় তখন তা পশুত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। পক্ষান্তরে শরীয়তসম্মত পন্থায় যদি তা সুনিয়ন্ত্রিত থাকে তবেই তাতে যেমন সেরা সৃষ্টি মানুষের সম্ভ্রম বজায় থাকে তেমনি তাতে সামাজিক ভিত্তিমূল সুদৃঢ় থেকে বিশ্ব সভ্যতায় সূচিত হয় সত্যিকারের প্রগতি ও সমৃদ্ধি। আজকের পাশ্চাত্য জগতও তাদের সম্পর্কে প্রকাশিত সমকালীন পত্র-পত্রিকা যে অবাধ যৌন আচরণে অশুভ পরিণতির সাক্ষ্য বহন করছে তা আজকের পৃথিবীর অজানা নয়।

আলোচ্য আয়াতে কারিমায় উপরোক্ত কয়েকটি বিশেষ লোভনীয় বস্তুর উল্লেখ করার পর এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা হলো ঃ

ذَالِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ -

অর্থাৎ "এসব নেয়ামত সামগ্রী হচ্ছে পার্থিব জীবনে ব্যবহার করার জন্যে। (এগুলোকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করার জন্যে নয়।) আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম ঠিকানা।" অন্য কথায় দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ ঠিক তেমনি অস্থায়ী যেমন অস্থায়ী দুনিয়ার জীবন। পক্ষান্তরে পরকালীন জীবন যেমন স্থায়ী তেমনি স্থায়ী সে জীবনের নেয়ামতসমূহ। এজন্যেই আল্লাহর ঘোষণা হলো একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে উত্তম ঠিকানা যার নিয়ামতসমূহ না ধ্বংস হবে না হ্রাস পাবে। বুদ্ধিমান তো সে ব্যক্তি, যে অস্থায়ী সুখ-শান্তি ও চাকচিক্যে মত্ত না হয়ে স্থায়ী শান্তি ও সার্বিক সাফল্য প্রাপ্তির চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে।

ছাব্বিশ

قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ ط لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ط۔

"বল, আমি কি তোমাদের (দুনিয়ার) ওসবের চেয়েও উত্তম বিষয়ের সন্ধান দেব ? (তা হচ্ছে) মুত্তাকীদের জন্যে তাদের রবের কাছে রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে ঝর্ণাসমূহ, তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আর রয়েছে পবিত্র যুগল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি।"

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫)

বেহেশতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে নারীও অন্তর্ভুক্ত

এ আয়াত অনুধাবন করার জন্যে অত্র গ্রন্থের প্রথম বিষয়সূচী "জান্নাতে নরের জন্য পবিত্র নারী আর নারীর জন্যে নিষ্কলুষ নর" দেখা যেতে পারে।

দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতসমূহের মধ্যে পূর্বোক্ত আয়াতে যে ছয়টি বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে পৃথিবীর মানুষ স্বভাবতই নগদ প্রিয় হওয়ায় ওসব বস্তুও আহরণে মত্ত থাকে। যারা ঈমানের মত অমূল্য ধন থেকে বঞ্চিত তারা তো দুনিয়ার জীবন ও বস্তু সামগ্রীকে প্রাধান্য দেয়। দুনিয়া উপার্জনের জন্যে মহামূল্যবান আয়ূ পর্যন্ত শেষ করে দেয়। আল্লাহ দুনিয়ার মানুষকে এসব মোহ থেকে মুক্তির জন্যে এবং নশ্বর পৃথিবী থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চিরস্থায়ী শান্তি সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে উক্ত আয়াতে পরকালীন জীবনের স্থায়ী নিয়ামত ও প্রকৃত শান্তির সন্ধান দিয়েছেন। পূর্বে দুনিয়ার ছয়টি প্রধান নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতে তার বিপরীতে পরকালীন নেয়ামত সমূহের মধ্য থেকে প্রধান তিনটি নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে (১) জান্নাতের সবুজ বাগানসমূহ, (২) পবিত্র যুগল এবং (৩) আল্লাহর সন্তুষ্টি।

দুনিয়ার ছয়টি নেয়ামতের আলোচনার পরে আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন। "বল, আমি কি তোমাদের এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর নেয়ামতের সন্ধান দেব ? যারা আল্লাহকে ভয় করে, তার আনুগত্য করে তাদের জন্যে তাদের রবের কাছে রয়েছে এমন সবুজ বাগিচা

যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত থাকবে। আর থাকবে পবিত্র যুগল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি।

এখানে লক্ষণীয় যে পরকালীন নেয়ামতসমূহের মাঝেও পবিত্র যুগল তথা সকল প্রকার আবিলতা ও কলুষতা মুক্ত নারীর কথাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ পরকালীন জীবনে জান্নাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টির মত অতুলনীয় নেয়ামত-সমূহের সাথে দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ থেকে যে একটি নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে পবিত্র নারী। আয়াতে পবিত্র যুগল বলা হয়েছে। যুগল নর-নারী উভয়কে বুঝায়। সে ক্ষেত্রে নরের পবিত্রতা হলো মানসিক আর নারীর পবিত্রতা হলো দৈহিক ও মানসিক। অবশ্য ঈমান ও আমল ছাড়া এ পবিত্রতা অর্জন সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয় বেহেশত লাভ করা। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

সাতাইশ

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ج اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُO(ال عمران : ٣٥)

"স্মরণ কর যখন ইমরানের স্ত্রী বললো, হে রব ! আমার গর্ভস্থিত সন্তানকে তোমার জন্যে একান্তভাবে মান্নত করলাম। তুমি মেহেরবানী করে তা কবুল করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"

-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৫)

নারীর গর্ভস্থ সন্তানকে আল্লাহর রাহে মান্নত করার ইতিহাস প্রসংগ

পূর্ববর্তী নবীদের যুগে তাঁদের শরীয়ত অনুযায়ী আল্লাহর নামে সন্তান উৎসর্গ করার রীতি প্রচলিত ছিল। কোনো একটি সন্তানকে আল্লাহর কাজের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো এবং তাকে কোনো পার্থিব কাজে ব্যবহার করা হতো না। এ প্রথানুসারে মরিয়মের মাতা নিজের গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে মান্নত করলেন যে, তাকে বিশেষভাবে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতে নিয়োজিত করা হবে এবং অন্য কোনো জাগতিক কাজে নিযুক্ত করা হবে না। কিন্তু প্রসবান্তে যখন দেখলেন যে এটা তো কন্যা সন্তান। কন্যাকে কি আল্লাহর ঘরের খেদমতে নিয়োজিত করা যাবে ? এই ভেবে তিনি আক্ষেপ করে বললেন ঃ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى "হে রব ! আমি তো প্রসব করলাম একটা কন্যা সন্তান।"

একজন ঈমানদার নিজের জান-মাল ও সন্তান সন্তুতিকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করার বাসনা থাকা তার ঈমানেরই দাবী। যুগে যুগে মানব ইতিহাস থেকেও তাই প্রমাণিত। তাছাড়া সন্তানাদিকে সৎপথে চলার উপযোগী করে গড়ে তোলায় মাতা-পিতার ভূমিকাই কার্যকরী হয়ে থাকে অধিক। তবে মাতার যোগ্যতা ও মানসিকতা এ ক্ষেত্রে অধিকতর দায়ী ও ফলপ্রসূ। সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন-পালনে যেমন মাতার দায়িত্ব ও ভূমিকা বেশী তেমনি তাদের উপর অধিক প্রভাব থাকে মাতার। কারণ তারা পিতার তুলনায় মাতার সাহচর্য পায় অনেক বেশী। মরিয়ম জননীর এ ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে,

মাতারাও সন্তানাদির জীবন গঠনের পরিকল্পনা করতেন। সুতরাং আধুনিক নারী সমাজ প্রাচীন নারী সমাজের চেয়ে অগ্রসরতার দাবী করবে কিসের ভিত্তিতে ?

ইমরানের স্ত্রী মরিয়মের মাতা গর্ভস্থ সন্তান (অর্থাৎ মরিয়ম)-কে আল্লাহর জন্যে উৎসর্গ করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, "তুমি মেহেরবানী করে এ মান্নত কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সবকিছু শুন ও জান।"

কিন্তু আজকের মুসলিম সমাজে দেখা যায়, জনক-জননীরা সন্তান পাওয়ার জন্যে যেমন শিরকের পথ ধরে, তেমনি সন্তান লালন-পালনেও শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সন্তান কামনা করে কোনো মাযার বা কোনো অলীর কাছে। আবার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার নাম রাখা থেকে তার শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদিতেও প্রকাশ্য শিরকে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। হাদীস শরীফের ভাষায় সন্তানাদি স্বভাব ধর্ম ইসলামের উপর জন্ম নেয়, কিন্তু মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা ও মাজুসী (অগ্নিপূজক) বানিয়ে ছাড়ে। অথচ প্রাচীনকালের ইতিহাসে দেখা যায়, মরিয়মের মাতা পুরো তাওহীদী আকীদায় সন্তান কামনা করেছিলেন। এভাবে মান্নত মানার ব্যাপারেও মুসলমানদের প্রাচীন ইতিহাসে তাওহীদের শিক্ষা পাওয়া যায়।

আটাইশ

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّى وَضَعْتُهَا اُنْثٰى ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ط وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ج وَاِنِّى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّى اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○(ال عمران : ٣٦)

"তারপর যখন সে প্রসব করলো, তখন বললো, হে আমার রব ! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করলাম। অথচ আল্লাহ ভালভাবেই জানেন, কি সে প্রসব করেছিল। পুত্র কন্যার মত নয়। আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আমি তার ও তার সন্তানাদির জন্যে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৬)

পুত্রের চেয়ে যে কন্যার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছিল

আলোচ্য আয়াতে হযরত মারইয়াম (আ)-এর জন্ম বৃত্তান্তের প্রতি ইংগিত রয়েছে। তাঁর মাতা ইমরানের স্ত্রী ছিলেন নিঃসন্তান। একদা তিনি একজন পথিককে দেখলেন, সে তার বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছে। এতে তাঁর অন্তরে সন্তান লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আকুতি জাগ্রত হয়। তিনি কায়মনো বাক্যে আল্লাহর কাছে সন্তান প্রাপ্তির আবেদন জানালেন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তিনি গর্ভধারণ করেন।

তখনকার শরীয়তে প্রচলিত ইবাদাত পদ্ধতির মধ্যে আল্লাহর নামে সন্তান উৎসর্গ করার রেওয়াজও ছিল। কোনো সন্তানকে আল্লাহর নামে নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো এবং তাকে কোনো পার্থিব কাজে লাগানো হতো না। এ পদ্ধতি মোতাবেক হযরত মারইয়ামের মাতা নিজের গর্ভস্থ সন্তানকে বিশেষভাবে বায়তুল মোকাদ্দাসের খেদমতে নিয়োজিত করার মান্নত করলেন। গর্ভস্থ সন্তান ছেলে হবে কি মেয়ে হবে তা তাঁর জানা ছিল না। সন্তান প্রসব করার পর যখন দেখলেন যে, তিনি তো একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন। তখন আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বললেন, আয় আল্লাহ ! আমি তো আমার গর্ভস্থ সন্তানকে তোমার ঘরের খেদমতের জন্যে মান্নত করেছিলাম। কিন্তু এ কি ব্যাপার ! এযে একটা কন্যা সন্তান !

আল্লাহর তো জানা আছেই যে, তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন। কন্যাকে দিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসের খেদমত করানো যাবে কিভাবে ? মারইয়ামের মাতার এ সংশয়ের জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى "এ কন্যা সন্তানের মত কোনো পুত্র সন্তান নেই।" অর্থাৎ তুমি যে পুত্র চেয়েছিলে সে তো তোমাকে দেয়া কন্যার সমকক্ষা নয়। বরং তোমার আন্তরিকতার বরকতে এ কন্যা বিশ্বের কন্যাদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তার এমন সব গুণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, অনেক পুত্র সন্তান তার সমকক্ষ নয়। আয়াতের তরজমা করতে গিয়ে তাফসীর কারকগণ বলেছেন ঃ

وَلَيْسَ الذَّكَرُ الَّذِىْ طَلَبْتِ كَالْاُنْثٰى الَّتِىْ وُهِبْتِ۔

"যে পুত্র সন্তান তুমি চেয়েছো সেতো এ কন্যা সন্তানের মত নয়। অর্থাৎ তোমার চাহিত পুত্র সন্তানের চেয়ে তোমাকে প্রদত্ত কন্যা সন্তান আরও বেশী গুণাবলী ও মর্যাদার অধিকারী।"

মারইয়ামের মাতা কন্যাকে আল্লাহর ঘরের খেদমত করার অযোগ্য মনে করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন তার মান্নত মতে নিজের কন্যাকে দিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসের খেদমতের কাজ করানো কি সম্ভব ? ছেলে হলেই সে তার মান্নত পূরণ করা যেতো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল বিপরীত। সেই কন্যাকে দিয়েই আল্লাহ তার মাতার মান্নত পূরণ করার মত যোগ্যতা ও গুণ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা মাতার আন্তরিকতার প্রতি তাকিয়ে কন্যাকেই কবুল করে নিলেন।

"আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম।" কথাটি–মারইয়ামের মাতার। এ প্রসংগে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বলেন, এ থেকে বুঝা যায় যে, সন্তানের নাম রাখার অধিকার মাতারও রয়েছে। সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে মাতার ভূমিকা যথার্থ ও কাম্য। এ বিষয়ে তার অধিকার স্বীকৃত।

ইমরানের স্ত্রী নিজের কন্যা মারইয়ামকে শয়তানের আক্রমণ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে ছিলেন। আল্লামা ইবনে কাসীর হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে একটি হাদীস নকল করেছেন। যাতে বলা হয়েছে যখনই কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তখনই শয়তান তাকে স্পর্শ করে। এবং শয়তানের স্পর্শের কারণে সন্তান চিৎকার করে। তবে হযরত মারইয়াম এবং তার সন্তান এর ব্যতিক্রম। তাদেরকে শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি। এটা তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ করুণা স্বরূপ।

উনত্রিশ

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ ط قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ○ (ال عمران : ٤٠)

তিনি বললেন, হে আমার রব ! আমার ছেলে হবে কিভাবে ? আমি যে বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি ! আর আমার স্ত্রীও যে বন্ধ্যা ! আল্লাহ বললেন, এ অবস্থায়ই, আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।"

-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৪০)

বন্ধ্যা নারী ও বৃদ্ধ স্বামীর সন্তান লাভ

প্রসংগ ঃ বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতে নিবেদিত শিশু মারইয়ামের লালন-পালনের দায়িত্বে ছিলেন হযরত যাকারিয়া (আ)। তিনি ছিলেন মারইয়াম (আ)-এর খালু। হযরত যাকারিয়া (আ) যখনই মারইয়ামের কক্ষে প্রবেশ করতেন তিনি সেখানে আশ্চর্য ধরনের খাবার অসময়ের ফল দেখতে পেতেন। তালাবদ্ধ কক্ষে এসব খাবার দেখে হযরত যাকারিয়ার মনে সন্তান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগলো। তিনি ভাবলেন যে, আল্লাহ তালাবদ্ধ কক্ষে এ বাচ্চাকে আশ্চর্য ধরনের খাবার দিতে পারেন, তিনি আমার এ বৃদ্ধাবস্থায় আমাকেও তো একটা সন্তান দিতে পারেন। হযরত মারইয়ামের লালন-পালনে অসাধারণ খোদায়ী নিদর্শন দেখে তিনি নিজের জন্যে দোয়া করে বললেন, 'হে রব ! তোমার পক্ষ থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান দান কর। তুমি নিশ্চয়ই দোয়া শ্রবণকারী।"

অতপর একদিন হযরত যাকারিয়া (আ) মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। ফেরেশতারা তখন তাঁকে ডেকে বললো, আল্লাহ আপনাকে একটা পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন। সে সন্তান অনেকগুলো গুণেরও অধিকারী হবেন। আল্লাহর পাঠানো এ সুসংবাদের জবাবে উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত কথাগুলো বলেছিলেন। হযরত যাকারিয়া (আ) সন্দেহের কারণে এসব প্রশ্ন করেননি ; বরং তাঁর তো আল্লাহর শক্তি-সামর্থের উপর যথেষ্ট বিশ্বাস এবং আল্লাহর কুদরতের উপর প্রগাঢ় ঈমান ছিলই। তবুও তিনি জানতে চাইলেন যে, তাদের স্বামী-স্ত্রীর বার্ধক্য ও বন্ধ্যাত্ব বহাল রেখেই সন্তান দেয়া হবে, না এতে কোনোরূপ পরিবর্তন করা হবে ? আল্লাহ বললেন, অবস্থা যা আছে তাই থাকবে। এ অবস্থায়ও আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তান হবে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর কুদরতের ঐতিহাসিক সত্যতা বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত যাকারিয়া (আ) ছিলেন বৃদ্ধ আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। সন্তান লাভের জাগতিক অবস্থা তখন তাদের ছিল না। সেই অসম্ভব অবস্থায়ও হযরত যাকারিয়া মারইয়ামের কাছে অসম্ভব পরিবেশে অলৌকিকভাবে অসময়ের ফল দেখে আল্লাহর কুদরতের উপর প্রগাঢ় ঈমান থাকায় তিনি সন্তান প্রার্থনা করলেন। আজকের সমাজে একদিকে নিঃসন্তানেরা সন্তান পাওয়ার জন্যে ধর্ণা দেয় পীর, বুজর্গদের মাজারে, পথ ধরে শিরকের, সর্বশক্তিমান আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাওহীদ পরিপন্থী বিশ্বাস ও কর্মের দিকে তারা এগিয়ে যায়। অন্যদিকে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সন্তান উৎপাদনক্ষম যুগলেরা জন্মনিয়ন্ত্রণের পথ ধরে। সন্তান দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর যে পূর্ণ কুদরত বিরাজিত তা যেমন মরিয়ম (আ)-এর বিশ্বাস তেমনি হযরত যাকারিয়া (আ) এ বিষয়ে পূর্ণ ঈমান রাখতেন, কিন্তু আমাদের সমাজের লোকেরা এ ধরনের কাজে শিরকের পথে ধাবিত হয় অহরহ। অথচ হযরত যাকারিয়া (আ) বাহ্যিক অবস্থায় সন্তান প্রাপ্তির বয়স না থাকলেও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরতের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকায় তিনি একমাত্র তারই নিকট সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন। হযরত যাকারিয়া (আ) যখন দেখলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামকে শীতকালে গ্রীষ্মকালের ফলমূল এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফলমূল দিয়ে জীবিকা দান করছেন, তখন তাঁর বার্ধক্যেও সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। যদিও তাঁর সার্বিক অবস্থা ছিল সন্তান লাভের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি নিজে বার্ধক্য জনিত দুর্বলতার সম্মুখীন ছিলেন, চুলগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিল আর তাঁর স্ত্রীও ছিল বন্ধ্যা। এতদসত্ত্বেও সন্তান লাভের আকুতি তাঁর অন্তরের গভীরে দানা বেঁধে উঠলে তিনি নিবৃত্তে আকুল কণ্ঠে নিবেদন করতে থাকেন।

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ـ

"হে রব ! আপনি দয়া করে আপনার পক্ষ থেকে আমাকে একটা নেক সন্তান দিন। নিশ্চয়ই আপনি দোয়া শ্রবণকারী।" উত্তরে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা মারফত সুসংবাদ পাঠালেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى "আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া নামক সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন।" অর্থাৎ সন্তান তো দিচ্ছেন—তার নামও আল্লাহই নির্ধারণ করে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা সর্ব যুগে সর্বাবস্থায়ই তাঁর কুদরতের রহস্য দেখাতে পারেন। প্রয়োজন কেবল প্রগাঢ় ঈমানের।

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (ال عمران : ٤٢)

"তারপর এমন সময় উপস্থিত হলো যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উচ্চ সম্মানে মহিমান্বিত করেছেন, তোমাকে পবিত্রতা দান করেছেন, আর তোমাকে পৃথিবীর নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৪২)

পবিত্রতা নারীদের উচ্চ-মর্যাদায় উন্নীত করে

হযরত মারইয়ামের মাতার মান্নত অনুযায়ী তৎকালীন শরীয়তের রীতি অনুসারে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের খাদেমা ছিলেন। তিনি ছিলেন পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারিনী। তিনি সারা রাত আল্লাহর ইবাদাতে রত থাকতেন। মুজাহিদ বলেন ঃ হযরত মারইয়াম (আ) রাত্রিতে দীর্ঘ সময় ইবাদাতে মশগুল থাকার কারণে উভয় পাঁয়ে খুঁত এসে গিয়েছিল। আল্লাহ তাঁকে তৎকালীন বিশ্বের নারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন। এবং আল্লাহ যে দুনিয়ার যাবতীয় শৃংখলা ও কার্যাবলী আনজাম দান করেন এবং কোনো কিছুই আপনা আপনি যেমন সংগঠিত হয় না ; তেমনি প্রাকৃতিক নিয়মেই সবকিছু হয় না ; বরং প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতিও আল্লাহই নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তারই নিদর্শন স্বরূপ হযরত ঈসা (আ) মারইয়ামের গর্ভে স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে আল্লাহর অসীম কুদরতে পিতা ছাড়াই জন্ম নিলেন। এবং জন্মের পরেই নিজের পরিচয় দিয়ে লোকদের সাথে কথা বলতে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে তৈরী করেছেন মাতা-পিতা ছাড়া। আর হযরত ঈসা (আ)-কে সৃষ্টি করলেন পিতা ছাড়া কেবল মাতা থেকে। আল্লাহর এ কুদরতের নিদর্শন দেখানোর জন্যে এমন এক নারী অর্থাৎ হযরত মারইয়ামকে নির্বাচন করলেন যিনি রাতভর আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকতেন এবং তিনি ছিলেন নির্মল নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিণী।

আল্লামা ইবনে কাসীর হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস এ প্রসংগে উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, বিশ্বে চারজন মহিলা শ্রেষ্ঠ।

মারইয়াম বিনতে ইমরান, ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া, খাদিজা বিনতে খুওয়াইলাদ এবং ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ (স)। তিরমিযি একাই এ হাদীস রেওয়াত করেছেন আর একে বিশুদ্ধ বলে দাবী করেছেন।

এ আয়াতের অবতারণা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ সম্পর্কে ফেরেশতাগণ হযরত মারইয়ামের সাথে যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছেন তা হুজুর (স)-কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ মহান আল্লাহ তার অধিক ইবাদাত, দুনিয়া বিরাগ ও পূত-পবিত্রতার দরুন তাকে সর্বপ্রকার মলীনতা ও অপবিত্রতা থেকে পাক-সাফ করে নির্বাচন করেছেন আর তাঁর এসব মহত্বের দরুন তাকে বিশ্ব নারী সমাজের উপর মর্যাদা দিয়েছেন।-(ইবনে কাসীর)

একত্রিশ

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○

"হে মারইয়াম ! তোমার রবের আনুগত্য কর, তাঁকে সিজদা কর এবং রুকূ'কারীদের সাথে তুমিও রুকূ' কর।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৩)

মর্যাদাবান নারীরা সমাজ বিমুখ থাকে না

পূর্বের আয়াতে হযরত মারইয়াম (আ)-কে তৎকালীন নারী কুলের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা দানের ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে তাঁকে স্বীয় রবের অনুগত হওয়ার জন্যে, রবের সিজদা করার জন্যে এবং রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করার জন্যে স্বয়ং রাব্বুল আলামীন নির্দেশ দিয়েছেন। মানব সমাজের প্রত্যেক পর্যায়ে সকল কালের নর-নারীরা জীবনের সামগ্রিক কার্যাবলীতে হয়ত সত্য পথে চলেছে নয়ত চলেছে বাতিলের পথে। সকল নর-নারীকে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী হকপন্থী ও বাতিল পন্থী—এ দু' ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। মর্যাদাবান নারীরা বাস্তবে অন্যান্য মর্যাদার অধিকারীদেরই দলভুক্ত হয়ে চলবে এটাই স্বাভাবিক। রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করার অর্থ সমাজের সৎপন্থীদের দলভুক্ত থাকা এবং ব্যক্তিগতভাবেও সৎকাজ করা। দ্বিতীয়তঃ এর অর্থ এও হতে পারে যে, নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নামায আদায়ে অভ্যস্থ হও। তৃতীয়তঃ সমাজের অন্যান্য নারীদের সাথে সদাচরণ ও নম্রব্যবহার করার নির্দেশ দেয়াও এ আয়াতের অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ সমাজে যারা সদাচারী ও নম্র ব্যবহারে অভ্যস্থ—যাদের দ্বারা সমাজের লোকেরা কোনো কষ্ট পায় না, তুমিও তাদের দলভুক্ত হও। সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠাকামীদের সাথী হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় পরস্পরকে সহযোগিতা কর। যেমন আরেকটি আয়াতে রুকূ'র এ অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ -(المائدة : ٥٥)

এখানে প্রথমে সালাতের কথা বলা হয়েছে বিধায় পরবর্তীতে রুকূ' করা বলতে অনেক মুফাস্সির উপরোক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং সমাজে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

সমাজের জনসংখ্যার অর্ধেক যেমন নারী তেমনি বিশ্ব সৌন্দর্য সংস্থাপনে নরের মত নারীর ভূমিকাও কম নয়। ইসলাম নারীদেরকেও নির্ধারিত

পরিমণ্ডলে ও নির্দিষ্ট গণ্ডীতে থেকে সামাজিক শান্তি স্থাপনে ও সমাজের উন্নতি বিধানে সম্ভাব্য ভূমিকা রাখার অবকাশ দিয়েছে। এমন নয় যে, কেবল নরেরাই সমাজে সক্রিয় থাকবে আর নারীরা থাকবে নিস্ক্রীয় হয়ে। বস্তুত নারীদের নিস্ক্রীয় থাকা বা সমাজ বিমুখ থাকা বা সার্বিক কর্মকাণ্ডে কোনো ভূমিকা না রাখা, কখনো কোনো মর্যাদাশীল জাতি মাত্রেরই কাম্য হতে পারে না। ইসলামের গৌরবময় যুগেও নারীদের ভূমিকা ছিল সমাজের সার্বিক কল্যাণধর্মী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। রাসূলের যুগে নারীরা জিহাদের জন্য যুদ্ধ ময়দানেও গিয়েছিলেন।

বত্রিশ

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ط قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ ط اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ০(ال عمران : ٤٧)

"মারইয়াম (আ) বললেন, হে রব ! আমার পুত্র হবে কোত্থেকে ? আমাকে তো কোনো লোক স্পর্শ করতেও পারেনি ! বললেন, এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি কোনো কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করলে বলেন, "হয়ে যাও। অমনি তা হয়ে যায়।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৭)

মহান আল্লাহ নর ছাড়া শুধু নারী থেকে সন্তান দিয়েছেন

ফেরেশতারা হযরত মারইয়ামকে বললেন, "হে মারইয়াম আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে একটা বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হবে 'ঈসা ইবনে মারইয়াম।' তিনি ইহ-পরকালের সম্মানিত ও আল্লাহর ঘনিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। যিনি দোলনায় ও কোলে থেকে মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর যিনি পুণ্যবানদের একজন। তখন হযরত মারইয়াম আশ্চর্য হয়ে বললেন, "আমার গর্ভে কি করে সন্তান জন্মিবে ! আমি তো বিবাহিতা নই। আমি ব্যভিচারিণীও নই।" কারণ স্বাভাবিক নিয়মে তো নর-নারীর যৌন মিলনের ফলে সন্তানের জন্ম হয়ে থাকে। তিনি বলেন, "আমাকে তো কখনো কোনো নর স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। নাকি আমাকে বিবাহের নির্দেশ দেয়া হবে !" আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব আসলো। "অবস্থা এমনিই থাকবে।" ঠিক অমনিভাবে বলা হয়েছিল হযরত যাকারিয়া (আ)-কে। তাঁকেও বলা হয়েছিল তোমার বার্ধক্য ও তোমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব অবস্থা বহাল থাকা অবস্থায়ই তোমাদের সন্তান দান করা হবে।

অতপর আল্লাহর সৃষ্টির পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেই তা সৃষ্টি হয়ে যায়। তিনি বলেন, كُنْ (হয়ে যাও) অমনি তা হয়ে যায়। আল্লাহর দেয়া স্বাভাবিক নিয়ম-নীতির মধ্যে তো তা হয়ে থাকে। আর স্বাভাবিক নিয়মের বাইরেও তাঁর অসীম কুদরাতের দ্বারা কোনো কিছুর সৃষ্টি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ আল্লাহর কুদরতে বিশ্বাসী হতে পারেনি।

খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা (আ)-কে খোদার পুত্র ও খোদা বলে বিশ্বাস করে থাকে। এ আয়াতে তাদের এ ভুল ধারণার নিরসন করা হয়েছে। মাত্র ছয় মাস

পূর্বে হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর জন্ম যেমন একটা মুযিজা ছিল ; ঠিক তেমনি হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মও অপর একটি মুযিজা। ইয়াহ্ইয়া যদি অস্বাভাবিক ও আশ্চর্যজনকভাবে জন্মগ্রহণ করে খোদা না হয়ে থাকেন, তাহলে ঈসা কেন অস্বাভাবিক নিয়মে জন্মগ্রহণ করায় খোদা বা খোদার পুত্র হতে পারেন ? এ ভাষণে খৃষ্টানদের সেই ভুল বুঝিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য।

আল্লাহর জাত ও সিফাতে যে কাউকে সমকক্ষ মনে করা শিরক তেমনি মানুষের কোনো সিফাত-বৈশিষ্ট্যকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করাও শিরক। ইয়াহুদীরা বলতো ওযায়ের আল্লাহর বেটা আর খৃষ্টানরা বলতো ঈসা আল্লাহর বেটা। এভাবে আল্লাহর কিতাবের আহল হয়েও এ দু'টো সম্প্রদায়—ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা আল্লাহর সাথে মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য জন্মদান ও যৌন কর্মকে সম্পৃক্ত করে আল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

আল্লাহর সৃষ্টি পদ্ধতির একটা দিক উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কিছু সৃষ্টিতে আল্লাহ কোনো কারণ উপকরণের মুখাপেক্ষী নন। বরং তিনি কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করলে বলেন, 'হও' তখনই তা হয়ে যায়। মুফাস্সির ও মুহাক্কিক আলিমগণের মতে আল্লাহকে কোনো কিছু সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে 'কুন্' শব্দটিও বলতে হয় না। তাঁদের মতে 'কুন্' বলতে যতটুকু সময় লাগে আল্লাহর ইচ্ছা বলে কোনো কিছু ততটুকু সময়ের মধ্যেই সৃষ্টি হয়ে যায়। অর্থাৎ কোনো কিছু সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ তা'আলা 'কুন্' বলার প্রতিও মুহতাজ নন। বরং সে জন্যে তাঁর ইচ্ছা করাই যথেষ্ট। আল্লাহর অসীম কুদরতে তিনি আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন পুরুষ-স্ত্রী ছাড়া, হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন পুরুষ (আদম) থেকে, আর ঈসা (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন নারী (মারইয়াম) থেকে। এটা আল্লাহর কুদরত। কিন্তু আল্লাহর কুদরত প্রকাশ পায় বিশেষ কোনো কারণে, বিশেষ কোনো সময়ে। তাছাড়া সবকিছুই সাধারণত আল্লাহর আদত অনুসারেই প্রকাশ পায়। দুনিয়ার সাধারণ নিয়মই হলো আল্লাহর আদত। নাস্তিকরা যাকে বলে প্রকৃতি। বস্তুত প্রকৃতি বলতে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। আল্লাহই ভাল জানেন।

তেত্রিশ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ج

بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ج (ال عمران : ١٩٥)

"অতপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া এই বলে কবুল করে নিলেন, আমি তোমাদের মধ্য হতে কোনো আমলকারীর আমল বৃথা যেতে দেই না ; চাই আমলকারী নর হোক বা নারী। তোমরা তো পরস্পরের সম্পূরক।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৫)

আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে নর-নারীর কোনো পার্থক্য নেই

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আমলী ঈমানদার লোকদের কতিপয় দোয়া-মুনাযাতের বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে সে দোয়ার মনজুরী এবং আমলী লোকদের নেক আমলের বিপুল প্রতিদানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

সৎকাজ যেই করুক না কেন সেই তার পুরোপুরি প্রতিদান ও সওয়াব পাবে। কাজটি চাই কোনো পুরুষই করুক অথবা কোনো নারীই করুক। প্রতিদান প্রাপ্তিতে উভয়ের জন্যে একই নিয়ম। আল্লাহর দরবারে এমন কোনো নিয়ম নেই যে, একই কাজ যদি পুরুষ করে তবে এক প্রকার ফল পাবে, আর যদি স্ত্রীলোকেরা করে তবে অন্য প্রকারের ফল পাবে। আল্লাহ্ নর ও নারীর পার্থক্যের দরুন তাদের আমলের প্রতিফলের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর কথা হলো– بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ "তোমরা (নর-নারী) পরস্পরের অংশ বিশেষ।" কাজেই আমলের ফলাফলের দিক থেকেও কোনো তারতম্য নেই বা থাকবে না।

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ বা স্বল্প ধারণার লোকেরা মনে করে থাকে যে, ইসলাম কেবল পুরুষদের প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেয়। নারীদের কোনো মর্যাদা বা অধিকার ইসলামে নেই। এমনকি আজকের সমাজে কিছু নামধারী মুসলিম যুবক-যুবতীদেরও এমনি ধারণা রয়েছে। উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে ইসলামী তাহজীব-তমদ্দুনের যথার্থ ধারণা ও আমল না থাকার কারণে এবং

আন্তর্জাতিক ইসলাম বিদ্বেষীদের ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলমানদের একটি অংশের মধ্যে অতি সুকৌশলের এ জাতীয় বিষক্রিয়ার সংক্রমন ঘটেছে।

ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সত্যিকার ধারণা না থাকার কারণে মুসলিম সমাজের কতিপয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও বিশ্বের অমুসলিমদের ইসলাম বিরোধী শ্লোগান নিজেদের মধ্যে প্রচলন বরং নিজেরা তা গ্রহণ ও বরণ করে নিচ্ছে। যেমন 'সাম্প্রদায়িকতা'। যে ইসলাম সাম্প্রদায়িকতার মূলোৎপাটনকারী সার্বজনীন আদর্শ। সে ইসলামকেই দুর্নাম করা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার নামে।

আল-কুরআনের উপস্থাপিত নারী পুরুষের মর্যাদার পার্থক্যহীনতা বরং নর-নারীদের যথোপযুক্ত মর্যাদার ঘোষণা আজকের বিশ্বে কার্যকর না থাকার দরুণ উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে নারী দিবস শিশু দিবস ইত্যাদি দিবসগুলো আন্তর্জাতিকভাবে উদযাপন করা হচ্ছে। কিন্তু ইসলামের বিধি-বিধানগুলো সমাজে বাস্তবায়িত হলে এসব দিবস পালনের কি প্রয়োজন হতো?

তেমনি তাদের আরেকটি শ্লোগান 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার ও নিরাপত্তার স্বার্থে তারা এ শ্লোগানটি উচ্চারণ করেন। কিন্তু ইসলামী জীবন বিধানে অমুসলিমদেরকে অধিকার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে, তা তথাকথিত কোনো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রেও যে নেই, সেই সত্যটুকু জানা না থাকার কারণেই অথবা জেনে বুঝে বিদ্বেষবশতঃ এ শ্লোগানটি উচ্চারণ করা হচ্ছে।

এভাবে নারীর অধিকার ও মর্যাদার বিষয়, দাদার বর্তমানে পিতার মৃত্যুতে দাদার সম্পত্তিতে নাতির অংশ, নারীদের পর্দা ব্যবস্থা—ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের বিধি-বিধান নিয়ে এদের আপত্তি ! এসব বিষয়ে এবা অমুসলিম, নারী ও ইয়াতীম নাতির নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে অস্থির ! এ যেন মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ। যে আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা ও পালনকারী, তাঁর চেয়ে যেন সৃষ্টির জন্য এদের দরদ বেশী !

চৌত্রিশ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنهَا زَوجَهَا وَبَثَّ مِنهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَّنِسَاءً ج -(النساء : ١)

"হে মানব সমাজ ! তোমাদের রবের বিষয়ে সতর্ক থাক। যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণী থেকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তার থেকে তৈরী করেছেন তার স্ত্রীকে। আর তাদের দু'জন থেকে বিস্তার করিয়েছেন অগণিত নারী পুরুষ।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১)

যৌন আকর্ষণ সৃষ্টির মূল লক্ষ্য মানব বংশের বিস্তার সাধন

পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ)। আর তারই দেহ থেকে সৃষ্টি তাঁর সংগিনী বিবি হাওয়া (আ)। আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ) তাঁর তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলেন, হাওয়া (আ)-কে হযরত আদম (আ)-এর বাম পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আদম (আ) তখন ঘুমে ছিলেন। জেগে দেখেন তাঁর পার্শ্বে এক মহিলা শায়িত আছে। তিনি আশ্চর্যান্বিত হন। অতপর জৈবিক চাহিদায় স্বাভাবিকভাবে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, পুরুষ থেকে মহিলা সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং তার প্রয়োজনও রাখা হয়েছে পুরুষের প্রতি।

পৃথিবীর সকল মানুষের মূল উৎস হলো হযরত আদম (আ)। সকল মানুষ তাঁরই সন্তান। সুতরাং দুনিয়ার জীবনে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা অসংগত ও অযৌক্তিক। ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা মারাত্মক গুনাহ। মানুষ মূলত জন্মসূত্রেই পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। আত্মীয় স্বজনের পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদকে ইসলামী পরিভাষায় 'সেলায়ে রেহমী' বলা হয়। হাদীস শরীফে আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহানবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘ জীবন প্রত্যাশা করে, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা।

কুরআনের আয়াতে আদম (আ) থেকে তাঁর জুড়ি তৈরী করার কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু জুড়ি তৈরীর বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। তাফসীরে ইবনে কাসীরের পূর্বোক্ত বর্ণনা অন্য কতিপয় তাফসীরেও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া বাইবেলেও এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে নিরব বিধায় অনেক তাফসীর কারক এ বিষয়ে নিরব থাকারই পক্ষপাতি। আর এটাই যুক্তিযুক্ত ও অধিকতর সত্যের নিকটবর্তী। আল্লাহই ভাল জানেন।

আয়াতের শেষাংশে আদম-হাওয়ার মধ্য থেকে অসংখ্য নারী-পুরুষ সৃষ্টির কথা বর্ণিত হয়েছে। আর পৃথিবীর প্রথম যুগলের পরবর্তী যুগলসমূহ থেকেও ক্রমিক ধারায় মানব বংশ বিস্তার লাভ করেছে। মূলত নর-নারীর সৃষ্টি ও তাদের পরস্পরের প্রতি স্বভাবগত আকর্ষণ সৃষ্টির পেছনে রয়েছে পৃথিবীতে মানব বংশ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চালু রাখা। মহান রাব্বুল আলামীন ঐ স্বভাবগত আকর্ষণ নিয়ন্ত্রণে রেখে মানব সমাজে নিষ্কলুষ ও সুশৃংখলিত রাখার ব্যবস্থাও দিয়েছেন। কিন্তু স্থূল দৃষ্টির মানুষ স্রষ্টার দেয়া ভারসাম্য হারিয়ে নিছক পশুত্ব প্রবণতার প্রতি ঝুঁকে গিয়ে সমাজে নানাবিধ যৌন অনাচার সৃষ্টিতে মত্ত হয়ে পড়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো সভ্যতার নামে অনেকে এ ঝোঁক প্রবণতাকে প্রকাশ্যে লাইসেন্স দিয়ে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দিয়ে সেরা সৃষ্টির মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসার উপরোক্ত প্রথম আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে মানব মণ্ডলী ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার বিরুদ্ধাচারণকে ভয় কর। এমন মহান সত্বাকে ভয় কর, যিনি তোমাদের সবাইকে একই মানুষ আদম (আ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ প্রথমত আদম (আ) থেকে তাঁর স্ত্রীকে এবং পরবর্তীতে সেই যুগল থেকে পৃথিবীর সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

এখানে মানব মণ্ডলী বলে পুরুষ-স্ত্রী এবং রাসূল (সা)-এর সময়কার ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে। সকল যুগের সকল মানুষকে আল্লাহর ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেহেতু তিনিই একমাত্র 'রব' বা প্রতিপালক। তাঁর রবুবিয়ত বা প্রতিপালন কার্যে অন্য কোনো শক্তির বিন্দুমাত্র দখল নেই। সুতরাং একমাত্র তাঁর ব্যাপারে তাকওয়া বা সতর্কতা অবলম্বন করে একই আদমের বংশোদ্ভূত

হওয়ার কারণে সকল মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করার প্রতি উক্ত আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ আয়াতটি বিয়ের খুতবায় পাঠ করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (স) বিয়ের খুতবায় এ আয়াতটি পাঠ করতেন। যেন আলোচ্য আদম সন্তানদ্বয় তাদের দাম্পত্য জীবনের শুরুতেই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে।

পঁয়ত্রিশ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّتُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّتَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط

"আর তোমরা যদি ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি ইনসাফ করতে না পারার আশংকা কর, তবে অন্যান্য স্ত্রীলোকদের মধ্য হতে তোমাদের পসন্দসই দু'জন অথবা তিনজন অথবা চারজনকে বিয়ে করতে পার। যদি তাদের মধ্যে ইনসাফ করতে পারার ব্যাপারে আশংকা থাকে, তবে মাত্র একজনকে নিয়েই তুষ্ট থাকবে, অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩)

একজন পুরুষ শর্ত সাপেক্ষে সর্বাধিক চারজন নারীকে বিয়ে করতে পারবে

ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে ইয়াতীম মেয়েদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ন করা হতো। তাদের সৌন্দর্য ও সম্পদের মোহে অভিভাবকরা নামে মাত্র মোহর দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে নিতো অথবা সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার ব্যবস্থা করতো। উক্ত আয়াত ও তৎপূর্ব আয়াতে তাদের এ হীন লালসাবৃত্তি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (স)-এর যুগে ঠিক এমনি ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল। জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি ইয়াতীম মেয়ে ছিল। সে ব্যক্তির একটি বাগান ছিল, যার মধ্যে উক্ত ইয়াতীম বালিকাটিরও অংশ ছিল। সে ব্যক্তি বালিকাটিকে বিয়ে করলো। তাকে মোহর তো দিলই না, বরং মেয়েটির বাগানের অংশও সে আত্মসাত করে নিলো। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে।

ইসলাম পূর্ব যুগে দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মমতেই বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ইউরোপের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মিঃ ডিউন পোর্ট বহু বিবাহের একজন বড় প্রবক্তা। তিনি তার মত প্রতিষ্ঠায় পবিত্র ইনজীল গ্রন্থের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তেমনি ইউরোপের পাদরী নিকসন, জন মিল্টন এবং আইজাক

টেইলর প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বহু বিবাহ প্রথা চালু করার জন্যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এমনকি পণ্ডিত ডিরাক অসংখ্য স্ত্রী রাখার পক্ষপাতি। তাঁর মতে একজন পুরুষ দশ থেকে সাতাইশজন স্ত্রী রাখতে পারবে। যে কৃষ্ণকে হিন্দুরা দেবতা বলে স্বীকার করে সেই কৃষ্ণেরও দশাধিক স্ত্রী ছিল। আজকের বিশ্বে যেসব জাতির মধ্যে বহু বিবাহ প্রথার উপর বিধি-নিষেধ রয়েছে তাদের মধ্যেও নারী-পুরুষের বন্ধুত্ব এবং নর-নারীর অবাধ মেলামেশার আবরণে ব্যভিচার ও অসামাজিক কার্যকলাপ চরমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ জাতীয় সমাজে বহু বিবাহের সুযোগ নেই ঠিকই কিন্তু প্রমোদবালাদের দৌরাত্ম সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাছাড়া ব্যভিচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠাই এ সমাজের বৈশিষ্ট্য। আজকের পাশ্চাত্য সমাজ এদিক থেকে শীর্ষে। তারা পরিবার ভাংগা জাতিতে পরিণত হয়ে চরম উৎকণ্ঠায় জীবন-যাপন করছে।

মোটকথা, ইসলাম পূর্ব যুগে অবাধেই বহু বিবাহ প্রথা চালু ছিল। বিভিন্ন ধর্ম ও দেশের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এর প্রতি কোনো বাধা-নিষেধও ছিল না। ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান, হিন্দু, আর্য ও পারসিকদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইসলামী শরীয়তের প্রাথমিক স্তরে কোনো সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই এ প্রথা চালু ছিল। অধিকন্তু তারা এসব স্ত্রীদেরও বাদী-দাসীদের মত রাখতো। তাদের প্রতি কোনো ইনসাফ করা হতো না। তাদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ন করা হতো। দু' একজনের প্রতি কিছু লক্ষ্য রাখা হতো আর বাকী সবাইর প্রতি প্রদর্শন করা হতো চরম অবহেলা ও যুলুম-অত্যাচার।

ইসলাম নারীদের প্রতি এসব যুলুম-অনাচারের প্রতিরোধ করেছে। বহু বিবাহের প্রতি আরোপ করেছে প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ। ইসলামী শরীয়ত একই সময়ে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখাকে হারাম ঘোষণা করেছে। একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের জন্যে ইসলাম বিশেষ তাকীদ দিয়েছে এবং ইনসাফের পরিবর্তে যুলুম করে থাকলে তার বিরুদ্ধে শাস্তির ঘোষণা দিয়েছে।

উপরোক্ত আয়াত একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয় বিচার-ইনসাফের শর্তে। যে ব্যক্তি এ ইনসাফ ঠিক রাখতে পারবে না তাকে এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যে ব্যক্তি এ শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হবে না ইসলামী আদালত তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

আধুনিক সমাজে যারা একাধিক স্ত্রী রাখার চরম বিরোধী বরং এটাকে স্ত্রীদের প্রতি যুলুম মনে করে। এমনকি কিছু নব্য চিন্তাধারার তথাকথিত উদার নীতির ধ্বজাধারীরা ইসলামী শরীয়তের সংখ্যা নির্ধারণকেও নারীর প্রতি

অবিচার মনে করে থাকে। তাদের উচিত ইসলাম পূর্ব অবস্থার পূর্ণ ইতিহাস জেনে নেয়া, অন্যান্য ধর্মমতের বক্তব্য জানা এবং তাদের সম মতাবলম্বীদের সার্বিক অবস্থা অবলোকন করা ও তাদের স্ত্রীদের কাছে তাদের খবর নেয়া। এরা বৈধ পত্নী রাখার প্রতি ঘোর প্রতিবাদকারী হলেও অবৈধ উপপত্নী বা বান্ধবীর সাথে অবাধ মেলামেশায় কিন্তু কোনো আপত্তি তোলে না। একজন স্ত্রী ঠিক রেখে একাধিক নারী গমনে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

ইসলামী শরীয়ত উপরোক্ত সামাজিক ও নৈতিক পরিণতিকে বহু বিবাহের চেয়েও মারাত্মক মনে করে। তাই যৌন অরাজকতা ও সামাজিক উচ্ছৃংখলতা যাতে প্রশ্রয় না পায়, সে জন্য ইনসাফের শর্ত সংরক্ষণ সাপেক্ষে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। আবার ইনসাফ ভঙ্গের ক্ষেত্রে ইসলামী আদালতের ব্যবস্থা গ্রহণেরও বিধান রয়েছে। আদালত ইনসাফ কায়েমের জন্য স্বামীকে শাস্তির নির্দেশ দিতে পারবে।

স্ত্রীর সংখ্যা সর্বোচ্চ চার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করার জন্যে কুরআনে যেমন সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে তেমনি হাদীসেও তার বহু প্রমাণ রয়েছে।

গায়লান ইবনে আসলামা সাকাফী নামে এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর দশজন স্ত্রী ছিল। তাঁর স্ত্রীরাও তাঁর সাথে মুসলমান হয়ে গেলেন। মহানবী (স) নির্দেশ দিলেন এ দশজন স্ত্রীর মধ্য থেকে যে কোনো চারজনকে রেখে বাকীদের তালাক দিয়ে দিতে। তিনি রাসূল (স) নির্দেশ মোতাবেক তাই করলেন।–(মেশকাত ২৭৪ পৃঃ)

কায়েস ইবনুল হারিস আসাদী (রা) বলেন, আমি যখন মুসলমান হলাম, তখন আমার আট স্ত্রী ছিল। আমি বিষয়টি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোচরীভূত করলাম। তিনি আমাকে চারজন স্ত্রী রেখে বাকী সবাইকে বিদায় করে দিতে বললেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বহু বিবাহ

ইউরোপীয় নাস্তিক ও বস্তুবাদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু বিবাহের বিষয়টিকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আসছে। তাদের মতে (নাউযুবিল্লাহ) তিনি যৌন স্পৃহা দমন করার জন্যেই এমনটি করেছেন। কিন্তু দুনিয়ার ভোগবাদী মানুষের সাথে তো মহানবী (স)-এর কোনো তুলনাই চলে না। যে কোনো নিরপেক্ষ চিন্তার বুদ্ধিজীবি লোক মহানবীর জীবন-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করলে এরূপ চিন্তা করতে পারে না। কারণ তাঁর জীবন-পদ্ধতিই প্রমাণ করবে যে, তিনি এ উদ্দেশ্যে তা করেননি।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন তৎকালীন আরব জাহানের সামনে উন্মুক্ত ছিল। বাল্য জীবন থেকে তিনি সবাইর কাছে ছিলেন নির্মল চরিত্রের অধিকারী আল আমীন বা বিশ্বাসী হিসেবে। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন চল্লিশ বছর বয়স্কা এমন এক বিধবাকে যার ইতিপূর্বে আরও দু'জন স্বামী মারা গিয়েছে। মজার ব্যাপার হলো তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার পর মহানবী (স) হেরা গুহায় মাসের পর মাস সময় ধরে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। আরবের কে এ ঘটনা জানতো না ? তাঁর সেই প্রথমা স্ত্রী বিবি খাদিজা (রা)-এর সাথে তিনি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন।

এ পঞ্চাশ বছর বিশেষ করে তাঁর যৌবনকাল সবটাই মক্কাবাসীদের চোখের সমানেই অতিক্রান্ত হয়েছে। মক্কায় কোনো শত্রুও তাঁর চরিত্রের ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ পোষন করতো না। শত্রুরা তাঁকে যাদুকর, উন্মাদ ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করেছে সত্য, কিন্তু কখনো তাঁকে ভোগ সর্বস্ব বা যৌন বিকার গ্রস্ত হওয়ার মিথ্যা দাবী করতে পারেনি।

আমরা দেখতে পাচ্ছি ৫৪ বছর বয়স পর্যন্ত মহানবী (স) একজন স্ত্রী নিয়েই ঘর সংসার করেছিলেন। অর্থাৎ পঁচিশ বছর হযরত খাদিজা (রা)-কে নিয়ে এবং চার বছর হযরত সাওদা (রা)-কে নিয়ে তিনি দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছেন। তারপর আটান্ন বছর বয়সে তাঁর চারজন স্ত্রী একত্রিত হন। অন্যান্যদেরকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করেন পরবর্তী দু' তিন বছরে। আমরা জানি সাহাবায়ে কিরাম পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সবাই ছিলেন মহানবী (স)-এর উপর নিবেদিত প্রাণ। এমতাবস্থায় তিনি তো ইচ্ছা করলে অনেক সংখ্যক কুমারী মেয়েকেই স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। একমাত্র হযরত আয়েশা (রা)-কে কুমারী স্ত্রী হিসেবে নবী (স)-এর সান্নিধ্যে আসেন। কাজেই তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের সমালোচনার কোনো ভিত্তিই ধোপে টিকে না। ইতিহাস তার জীবন্ত সাক্ষী।

ছত্রিশ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْـًٔا مَّرِيْـًٔا ۝ (النساء : ٤)

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মোহর খুশী মনে আদায় করে দাও। অবশ্য তারা যদি নিজেদের খুশীতে মোহরানার কিছু অংশ তোমাদের মাফ করে দেয়, তবে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করতে পার।"–(সূরা নিসা ঃ ৪)

স্ত্রীদের মোহর তাদেরকেই দিতে হবে সন্তুষ্টি চিত্তে উদার মনে

স্ত্রীদের মোহরানার টাকা পরিশোধের ব্যাপারে তখনকার দিনে নানা ধরনের যুলুম অত্যাচার চলতো। যেমন মোহরানার টাকা স্ত্রীদের হাতে না পৌঁছিয়ে পৌছানো হতো অভিভাবকদেরকে। আর অনেক সময় অভিভাবকরা তা আদায় করে নিজেরাই আত্মসাত করতো। তাই উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বামীর প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, মোহরানার টাকা তাকেই পরিশোধ কর, অন্যকে নয়। এখানে অভিভাবকদের প্রতিও এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মোহরানা আদায় করে তা যার প্রাপ্য তার হাতেই অর্পণ কর। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে।

দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করার ব্যাপারে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা ও তিক্ততা থাকতে পারবে না। তখনকার দিনে মোহরানা পরিশোধ করাকে জরিমানা দেয়ার মতো মনে করা হতো। স্বামীর এ অনাচার ও অভিভাবকদের সংকীর্ণতা রোধ করার লক্ষ্যেই রাব্বুল আলামীন نِحْلَةً (নিহ্লাতান্) শব্দ ব্যবহার করেছেন।

অভিধানে نِحْلَةً বলতে ঐ দানকে বলা হয় যা অত্যন্ত খুশীমনে ও আন্তরিকতা সহকারে প্রদান করা হয়। মূলত স্ত্রীদের মোহরানা অবশ্য পরিশোধ ঋণ বিশেষ। এ ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরী। অন্যান্য ঋণ যেমন সন্তুষ্টচিত্তে অবশ্য দেনা হিসেবে পরিশোধ করা হয়, স্ত্রীর মোহরানাও তেমনি হৃষ্টচিত্তে ও উদারমনে পরিশোধ করা কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ অনেক স্বামী স্ত্রীকে অসহায় অবলা পেয়ে নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করে বা কৌশল অবলম্বন করে মোহরানা মাফ করিয়ে নিয়ে থাকে। তখনকার দিনেও এমনটি করা হতো। কিন্তু এভাবে মাফ করিয়ে নিলে প্রকৃতপক্ষে তা মাফ হয় না। কারণ এ ধরনের মাফ করা তো স্বেচ্ছায় না হয়ে পরিবেশ পরিস্থিতির চাপের মুখে হয়ে থাকে। এ ধরনের যুলুম প্রতিরোধ করার জন্যে আল্লাহর নির্দেশ হলো ঃ

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا ـ

অর্থাৎ "যদি স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মোহরানার কিছু অংশ ক্ষমা করে দেয়, তবেই তোমরা হৃষ্টমনে তা ভোগ করতে পার।" সুতরাং চাপ প্রয়োগ কিংবা কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি করে ক্ষমা করিয়ে নেয়ার অর্থ কোনোক্রমেই ক্ষমা হিসেবে গণ্য হবে না।

এ ধরনের বহু নির্যাতন মূলক প্রথা তৎকালীন জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল। কুরআন সেসব জুলুমের উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আজও মুসলিম সমাজে অনুরূপ নির্যাতন দেখা যায়। আল-কুরআন সর্বপ্রকার নারী নির্যাতনসহ মোহর সংক্রান্ত জুলুমকেও পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছে।

হযরত মাওলানা মুফতি শফী (র) তাঁর তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে বলেন, "আজকের যুগে স্ত্রীরা মনে করেন যে, স্বাভাবিকভাবে যেহেতু মোহরানা পাওয়াই যাবে না, বরং দাবী করলে তিক্ততা সৃষ্টি এমনকি সম্পর্কের ফাটল সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয় সেহেতু তারা মোহরানার দাবী মাফ করে দিয়ে থাকেন। কিন্তু এ ধরনের ক্ষমার দ্বারা মোহরানা ঋণ কখনো মাফ হয় না।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলতেন, মোহরানার অর্থ স্ত্রীর হাতে দেয়ার পর স্ত্রী যদি তা ইচ্ছা মত খরচ করার সুযোগ লাভ করা সত্ত্বেও স্বামীকে দিয়ে দেয়। কেবলমাত্র তখনই সেটাকে মাফ করার পর্যায়ে গণ্য করা যেতে পারে।

মীরাসের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পিতার মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছেলেরাই দখল করে বসে। বোনদের অংশ দেয়া প্রয়োজন মনে করে না, কেউ কেউ দ্বীনদারীর খেয়ালে বোনদের থেকে মাফ চেয়ে নেয়। বোনরা যেহেতু মনে করে তাদের পাওনা আদায় করা সহজ নয়, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভাইদের মন রক্ষার জন্যে মুখে মাফ করে দেয়। পিতার মৃত্যুর পর মায়ের অংশ বিশেষত বিমাতার প্রাপ্য অংশ নিয়েও একই অবস্থার

সৃষ্টি হয়। এসব অংশীদারের প্রাপ্য যে আন্তরিক তুষ্টির সাথে ক্ষমা করা হয় না বিধায় যুলুমের অন্তর্ভুক্ত, তা স্বতঃসিদ্ধ।

স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধের বিষয়টি ইসলামী শরীয়তে অনেক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত। কিন্তু মুসলিম সমাজ অন্যান্য জরুরী বিষয়ের ব্যাপারে যেমন উদাসীনতা প্রদর্শন করে ঠিক স্ত্রীর মোহরানার বেলায়ও তাই করে আসছে। অধিকন্তু আজকের মুসলিম সমাজে বিজাতীয়দের অনুকরণে যৌতুকের অভিশাপ জেঁকে বসেছে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। মেয়েদের মীরাস থেকে বঞ্চিত করার মত জঘন্য তৎপরতাও এজন্যে কম দায়ী নয়। এমনকি ইসলামের মৌলিক ইবাদাত পালনে অভ্যস্ত দীনদার ব্যক্তিরাও দীনের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবনে পশ্চাদপদ বিধায় এমনিভাবে দীনের বহু মৌলিক বিষয় সম্পর্কে উদাসীনতা প্রদর্শন করে থাকে। ফলে সমাজে দেখা দিয়েছে নানান অনাচার ও ইসলামী শরীয়ত পরিপন্থী রীতিনীতি। আর বাস্তব জীবনে মুসলিম-অমুসলিমের জীবন ধারা একাকার হয়ে পড়েছে। পরিণামে পৃথিবীর মানব সাধারণ বঞ্চিত হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অনিবার্য সুফল থেকে।

বস্তুত আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতে বিশ্বাসী লোকদের ঈমানী দায়িত্ব হলো সমাজে প্রচলিত এসব যুলুম-অত্যাচার থেকে দূরে থাকা। স্ত্রীর মোহরানার টাকা ও বোনদের প্রাপ্য মীরাস এবং ভাইদের মৃত্যুর পর ভাতিজা ও ভাইঝীদের মীরাস ও যাবতীয় সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং প্রাপকদের পাওনা হিসাব-নিকাশ করে পুরোপুরি তাদের পরিশোধ করা। নামায-রোযার চেয়ে এসবের গুরুত্ব দেয়া উচিত। কারণ নামায-রোযা তো আল্লাহর হক, অথচ এসবই হচ্ছে বান্দার হক। আল্লাহ সবাইকে সহীহ সমুঝ দান করুন।

সাঁইত্রিশ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ط نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ○

"পুরুষদের জন্যে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে যেমন প্রাপ্য অংশ রয়েছে। তেমনি নারীদের জন্যেও পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে। চাই তা কম হোক অথবা বেশী হোক, উভয়ের এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকেই) নির্ধারিত।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ৭)

পূর্বপুরুষদের সম্পত্তিতে নারী-পুরুষ উভয়েরই অংশ নির্ধারিত

আলোচ্য আয়াতে পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার আইনের সুস্পষ্ট বিধান প্রদানের পূর্বে তার ভিত্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে দু'টো আইনগত নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে। একটি নির্দেশ হলো মীরাস কেবল পুরুষদেরই প্রাপ্য নয়, নারীরাও মীরাসের হকদার। দ্বিতীয় নির্দেশটি হলো মীরাসের পরিমাণ যা-ই হোক না কেন, তা অবশ্যই ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টিত হতে হবে। তাছাড়া এ আয়াতে একথাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মীরাস আইন সকল প্রকার ধন-সম্পত্তির উপর কার্যকর হবে—স্থাবর, অস্থাবর, কৃষি-শিল্প সর্বপ্রকার সম্পত্তিই এর আওতায় আসবে।

ইসলামের মীরাস-আইন প্রবর্তনের পূর্বে আরব-অনারব জাতিসমূহের মধ্যে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে চলতো নানা ধরনের যুলুম-অত্যাচার। মুশরিকদের নিয়মে পিতার বড় ছেলে সকল সম্পত্তির মালিক হতো। মেয়েরা ও ছোট ছেলেরা হতো সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। আবার কোনো কোনো জাতির নিয়মে এতীম বালক-বালিকা ও নারীগণ মীরাসের বিষয়ে চরম যুলুমের শিকার হতো। আরবদের নিয়ম ছিলো, যারা অশ্বারোহণ করে ও শত্রুদের মোকাবিলা করে অর্থ-সম্পদ লুট করে আনার যোগ্যতা রাখতো, কেবল তারাই উত্তরাধিকার হতে পারতো। কোনো কোনো জাতির মধ্যে স্ত্রীরা স্বামীর কোনো অংশই পাওয়ার যোগ্য ছিল না। ইসলাম উপরোক্ত আয়াতের

ঘোষণা দিয়ে পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি বণ্টন সংক্রান্ত যাবতীয় জুলুম অত্যাচার রহিত করে পুরুষের ন্যায় নারীকেও অংশীদার ঘোষণা করে। ইসলাম দুর্বল ও নারীদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে, আর সে অধিকার সংরক্ষণেরও চমৎকার ব্যবস্থা করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়কার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। আউস ইবনে সাবেত (রা) তার স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক নাবালেগ পুত্র সন্তান রেখে মৃত্যু মুখে পতিত হন। প্রাচীন আরবীয় প্রথানুসারে তাঁর দুই চাচাত ভাই সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিয়ে গেল—স্ত্রী ও সন্তানদের কিছুই দিল না। কারণ তাদের মীরাসী আইনে নারীগণ কোনো অবস্থাতেই মীরাস পেত না। ফলে স্ত্রী ও দুই কন্যা এমনিতেই বঞ্চিতা হয়ে গেল। আর প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়ার কারণে পুত্রও বাদ পড়ে গেল। আউস ইবনে সাবেতের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এ অবস্থার বর্ণনা করে সন্তানদের অসহায়ত্বের অভিযোগ করলো। তখন পর্যন্ত উত্তরাধিকার সম্পর্কিত কুরআন পাকের কোনো হুকুম নাযিল হয়নি। তাই রাসূলুল্লাহ (স) উত্তর না দিয়ে ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

আলোচ্য আয়াতে কুরআন পাকের বাচনভংগী লক্ষণীয়। এখানে মৃত ব্যক্তির মীরাস বণ্টনের মৌলিক আলোচনায় পুরুষ ও নারীদের ওয়ারিশ হওয়ার কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য স্থানের ন্যায় পুরুষ ও নারীকে একত্রে উল্লেখ করা হয়নি। বরং এখানে পুরুষদের হক যেভাবে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে ; নারীদের হকও পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এতে করে পুরুষদের হক যেমন স্বাতন্ত্র ও গুরুত্বের দাবী রাখে, তেমনি নারীদের হকও স্বাতন্ত্র ও গুরুত্বের দিক থেকে কোনো অংশে কম নয় বলে প্রতিভাত হয়েছে। এভাবে ইসলাম নারীদের অধিকার ও মর্যাদার যথার্থতার ঘোষণা দিয়েছে। অন্যসব গোত্রের ও সম্প্রদায়ের ন্যায় ইসলাম কেবল বড় ছেলেকে অথবা কেবল ছেলেদেরকে অথবা শুধু কর্মক্ষম ছেলেদেরকে পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী ঘোষণা করেনি বরং ছেলে ও মেয়েদের হক পৃথকভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে। আবার এ মেয়েরা তাদের স্বামীদেরও মীরাসের মালিক বলে ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে।

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির এ বণ্টন মূলনীতি বর্ণনার শেষ দিকে বলা হয়েছে "চাই তা কম হোক অথবা বেশী হোক।" এই বলে মানুষের মূর্খতাসূলভ যুলুমপূর্ণ প্রথার নিরসন করা হয়েছে। কেননা কেউ কেউ নির্দিষ্ট কিছু সম্পদ কেবল যুবক পুরুষদের জন্যে নির্ধারিত বলে সেভাবেই তা বণ্টন করতো।

আটত্রিশ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ج فَاِنْ كَانَ لَهُٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْدَيْنٍ ط(النساء : ١١)

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদের এ বিধান দিচ্ছেন যে, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। যদি (মৃতের ওয়ারিশ) কন্যা হয় দু'য়ের অধিক, তবে তাদের জন্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। আর যদি একজন কন্যা থাকে তবে তার জন্যে মোট সম্পত্তির অর্ধেক। মৃতের মাতা-পিতা প্রত্যেকে পাবে ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ, যদি তার সন্তান থাকে। যদি তার সন্তান না থাকে এবং তাঁর ওয়ারিশ থাকে কেবল মাতা-পিতা। তবে সে ক্ষেত্রে মাতা পাবে এক-তৃতীয়াংশ। ভাই-বোন থাকলে মাতা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। উপরোক্ত বিধান তখন কার্যকর হবে যখন মৃতের অসিয়ত ও করয পরিশোধ করার পর তার সম্পত্তি বাকী থাকে।"-(সূরা আন নিসা ঃ ১১)

সম্পত্তি বণ্টনে কন্যার অংশই হলো মূল ভিত্তি

আলোচ্য আয়াতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টনের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমে কন্যাদের অংশ দেয়ার প্রতি এতবেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, কন্যাদের অংশকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করে এর অনুপাতে পুত্রদের অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ "এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সম পরিমাণ" এভাবে বলা হয়নি যে, দুই কন্যার অংশ এক পুত্রের অংশের সমপরিমাণ। সূরা নিসার ১৭৬নং আয়াতেও এ বিষয়ে একই হুকুম দেয়া হয়েছে।

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তের বিধান হলো, প্রথমতঃ সমস্ত সম্পত্তি থেকে মৃতের কাফন ও দাফনের খরচ নির্বাহ করা হবে। এতে অপব্যয় ও কৃপণতা–উভয়ই নিষিদ্ধ। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে মৃতের ঋণ পরিশোধ করা হবে। ঋণ পরিশোধে সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষ হয়ে গেলে কেউ ওয়ারিশী স্বত্ব পাবে না এবং কোনো অসিয়তও কার্যকর হবে না। যদি কোনো ঋণ না থাকে অথবা ঋণ শোধ করার পরও সম্পত্তি বাকী থাকে তবে তৃতীয় পর্যায়ে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে বৈধ অসিয়ত কার্যকর করা হবে। তার সমস্ত সম্পত্তি অসিয়ত করলে তা এ এক-তৃতীয়াংশ দিয়েই পালন করা যাবে—এর অধিক দিয়ে অসিয়ত পালন করা জায়েয নেই। ওয়ারিশদের বঞ্চিত করার নিয়তে অসিয়ত করা গুনাহের কাজ। চতুর্থ পর্যায়ে বাকী সম্পত্তি নির্দিষ্ট ওয়ারিশদের মধ্যে কুরআন-হাদীস অনুযায়ী বণ্টন করা হবে।

আমাদের সমাজে পিতার মৃত্যুর পর ছেলেরা মেয়েদের অংশ দেয় না বা দিতে গড়িমসি করে বা যথার্থ অংশ দেয় না। অনেক সময় বোনেরা ভাইদের সাথে তাদের প্রাপ্য অংশের জন্যে কিছু বলে না। কারণ তারা অংশ তো পাবেই না, শুধু শুধু ভাইদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে কি লাভ ? বোনেরা একথা চিন্তা করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চক্ষু লজ্জায় তাদের প্রাপ্য ক্ষমা করে দেয় বা তাদের দাবী উত্থাপন করে না। এ জাতীয় ক্ষমা করা বা দাবী না করা প্রকৃতপক্ষে শরীয়তী ক্ষমা নয়। বরং ভাইদের জিম্মায় বোনদের অংশ ও হক পাওনা থেকে যায়। যারা এভাবে ওয়ারিশী সম্পত্তি না দিয়ে তা আত্মসাত করে, তারা কঠোর গুনাহগার হবে। এদের মধ্যে নাবালেগ কন্যাও থাকে। তাদের অংশ না দেয়া দ্বিগুণ গুনাহর কাজ। এক গুনাহ্ শরীয়তসম্মত ওয়ারিশের অংশ না দিয়ে তা আত্মসাত করার ; আর দ্বিতীয় গুনাহ্ ইয়াতীমের সম্পত্তি হজম করে ফেলার।

অতপর আলোচ্য আয়াতে কারিমায় কন্যাদের মীরাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যদি পুত্র সন্তান না থাকে, কেবল দুই বা দু'য়ের অধিক কন্যা সন্তান থাকে তবে তারা পাবে মোট সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। বাকী এক-তৃতীয়াংশ পাবে মৃত ব্যক্তির মাতা-পিতা, স্ত্রী অথবা স্বামী প্রমুখ ওয়ারিশগণ। যদি পুত্র সন্তান মোটেই না থাকে আর কন্যা থাকে একজন। তখন সে পাবে অর্ধেক। অবশিষ্ট অর্ধেক পাবে অন্যান্য ওয়ারিশগণ।

উনচল্লিশ

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ط(النساء : ١٢)

"তোমাদের স্ত্রীদের সন্তান না থাকলে তোমরা তাদের অর্ধেক সম্পত্তি পাবে। যদি তাদের সন্তান থাকে তবে তোমরা তাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। এ বিধান কার্যকর হবে তাদের করয ও অসিয়ত থাকলে, তা পরিশোধ করার পর। আর তারা পাবে তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ, যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তবে তারা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাবে। এখানেও তোমাদের করয ও অসিয়ত কার্যকর করার পর এ হুকুম পালিত হবে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১২)

নারীরা যেমন বংশগত ওয়ারিশ তেমনি তারা বৈবাহিক ওয়ারিশও

আলোচ্য আয়াতে কারিমায় স্বামী ও স্ত্রীদের মীরাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী নারীগণও পুরুষদের মত বংশগত ও জন্মগত সম্পর্কের কারণে মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিশ হয়ে থাকে। মীরাস পাওয়ার ব্যাপারে যে যে অবস্থায় পুরুষদের অধিকার রয়েছে সে সে অবস্থায় নারীদেরও অধিকার রয়েছে। হযরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী (র) তাঁর তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে নারীদের মোহরানাকে করযের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শরীয়তে স্ত্রীর মোহরানার সমস্ত অর্থ তার হাতে দেয়ার বিধান আছে। তাদের আন্তরিক ও স্বেচ্ছায় ক্ষমাকৃত অংশ ছাড়া বাকী সম্পূর্ণ মোহরানার টাকাই স্বামীর জিম্মায় স্ত্রীর পাওনা।

মীরাসী আইনের চারটি স্তর : (১) দাফন-কাফন (২) ঋণ, (৩) অসিয়ত, (৪) মীরাস, ধারাবাহিকভাবেই বণ্টিত হয়ে থাকে। দাফন-কাফন ও ঋণ পরিশোধে যদি মৃত ব্যক্তির সমস্ত ত্যাজ্য সম্পত্তি নিঃশেষ হয়ে যায় তবে অসিয়ত ও মীরাস কার্যকর হবে না।

স্ত্রীর মোহরানার অর্থ পরিশোধ করা বাকী থাকলে তাও উপরে বর্ণিত ঋণের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং অসিয়ত ও মীরাস বণ্টনের পূর্বেই স্ত্রীর প্রাপ্য মোহরানা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এমনকি তাতে ত্যাজ্য সম্পদের সবটুকুই নিঃশেষ হলে অসিয়ত ও মীরাস কার্যকর হবে না। স্ত্রীগণ যদি স্বেচ্ছায় ও আন্তরিকভাবে মোহরানার অংশ বা সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দিয়ে থাকে তবে তা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যেসব স্বামীরা কৌশলে মোহরানা মাফ করিয়ে নেয় বা স্ত্রীদের বাধ্য করিয়ে থাকে এবং স্ত্রীরা অগত্যা কোনো অকাম্য পরিস্থিতির উদ্ভবের ভয়ে বাধ্য হয়ে মাফ করার কথা প্রকাশ করে ; এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ঐ মোহরানার অর্থ স্বামীর কাছে স্ত্রীর পাওনা থেকে যায়।

চল্লিশ

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ۝ (النساء : ١٥)

“তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারাই নির্লজ্জ কাজ ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পুরুষদের চারজন সাক্ষী নাও। যদি চারজন লোক ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে ঘরের মধ্যে বন্ধী করে রাখ—যতদিন না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফায়সালা ঘোষিত হয়।”–(সূরা আন নিসা ঃ ১৫)

নারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করার বিষয়ে কঠোরতা আরোপ

আলোচ্য আয়াতে ব্যভিচারে লিপ্ত নারীর বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করতে হলে চারজন পুরুষ সাক্ষী গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে নারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে শরীয়ত অত্যন্ত কঠোর বিধান দিয়েছে। প্রথমত এ জাতীয় ঘটনায় চারজন সাক্ষী তলবের নির্দেশ এবং তাদের সাক্ষ্য পাওয়া গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। চারজন সাক্ষী স্বচক্ষে দেখেছে এমন সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। দ্বিতীয়তঃ ঐ চারজন সাক্ষী হতে হবে পুরুষ—কোনো নারীর সাক্ষ্য এতে গ্রহণযোগ্য নয়। এ জাতীয় কাজে চারজন সাক্ষী পাওয়া বড়ই দুরূহ। তাই বলে এর অর্থ এ নয় যে, শরীয়ত বুঝি ব্যভিচারকে তেমন একটা ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে না। বরং এ ব্যাপারে নিরীহ্ নারী সমাজের প্রতি যাতে কোনো প্রকারের যুলুম-অত্যাচার করার কোনো অবকাশ না থাকে, সে জন্যেই এ কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে। কারণ, এ কঠোরতা না থাকলে যে কেউ ব্যক্তিগত জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে অহেতুক অপবাদ দিতে অথবা শত্রুতা উদ্ধারের সুযোগ খুঁজে পেতে পারে। অবলা-অসহায়া নারীকুলের রক্ষাকবচ স্বরূপ তাদের বিরুদ্ধে উত্থিত অভিযোগ প্রমাণিত করার পথে উপরোক্ত কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে।

চারজন পুরুষ সাক্ষী যদি বাস্তবিকই যথারীতি সাক্ষ্যদান করতে পারে তবেই অভিযুক্ত মহিলাকে শাস্তি দেয়া যাবে। এ শাস্তি ঐ নারীকে গৃহের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রেখে যন্ত্রণা দেয়া অথবা আল্লাহর কোনো চূড়ান্ত নির্দেশনার অপেক্ষা করার কথা আয়াতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য এ সম্পর্কে আল্লাহর চূড়ান্ত নির্দেশের বিষয়টি পরবর্তীকালে সূরা আন নূরে অবতীর্ণ হয়েছিল। বলা হয়েছে, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী উভয়কেই একশত বেত্রাঘাত করে শাস্তি দাও। অবশ্য এ একশত বেত্রাঘাত হলো অবিবাহিতের বিধান। আর বিবাহিতের বিধান হলো পাথর বর্ষণ করে হত্যা করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) উক্ত আয়াতে বর্ণিত أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً অথবা "আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফায়সালা ঘোষিত হয়" এর তাফসীর প্রসংগে বলেন ঃ يَعْنِى الرَّجْمُ لِلثَّيِّبِ وَالْجَلْدُ لِلْبِكْرِ অর্থাৎ "বিবাহিতের জন্যে পাথর বর্ষণে হত্যা করা আর অবিবাহিতের জন্যে বেত্রাঘাত করা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়েয ইবনে মালেক (রা) ও ইযদ গোত্রের জনৈকা মহিলার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তারা উভয়ে বিবাহিত ছিল বিধায় তাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা হয়েছিলো। তাছাড়া একজন ইয়াহূদীকেও ব্যভিচারের শাস্তি স্বরূপ প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা হয়েছিল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ (النساء : ١٩)

"হে তোমরা যারা ঈমান এনেছ ! জোরপূর্বক স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার হয়ে বসা তোমাদের জন্যে মোটেই হালাল নয়। আর তাদেরকে এজন্যে আটক করে রেখো না, যাতে করে তোমরা তাদের যে মোহরানা দিয়েছ তার কিছু অংশ আত্মসাত করে নিতে পার। অবশ্য তারা প্রকাশ্যে কোনো অশ্লিলতা করে বসলে সেটা ভিন্ন কথা। আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৯)

নারীদের জান-মালে বলপ্রয়োগ অবৈধ

জাহেলী যুগে নারীদের উপর স্বামীদের পক্ষ থেকে যেমন উৎপীড়ন-নির্যাতন চলতো, তেমনি চলতো ওয়ারিশদের পক্ষ থেকেও। ইসলাম উভয় ধরনের উৎপীড়নকে হারাম ঘোষণা করেছে। আল কুরআন বৈবাহিক উৎপীড়ন ও ওয়ারিশী উৎপীড়ন—দু'টোকেই হারাম করে দিয়েছে আর নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছে।

জাহেলী যুগে নারীদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চলতো। যেমন পুরুষ নিজেকে স্ত্রীর জান-মালের মালিক মনে করতো। নারীরা যার বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হতো, সে স্ত্রীর প্রাণকে নিজের মালিকানাধীন মনে করতো। স্বামীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশরা যেমন তার ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিশ ও মালিক হতো, তেমনি তারা তার স্ত্রীরও ওয়ারিশ ও মালিক হয়ে বসতো। ইচ্ছা করলে নিজেই তাকে বিয়ে করতো কিংবা অন্যের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তাকে বিয়ে দিয়ে দিতো। স্ত্রীর প্রাণের যখন এ অবস্থা তখন তার ধন-সম্পদের বিষয়টি তো বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ধরনের ভ্রান্তির ফলে নারীদের উপর চলতো নানা ধরনের নির্যাতন। ঐসব উৎপীড়ন-নির্যাতনের কতিপয় উদাহরণ নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

এক ঃ স্ত্রীদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অথবা পিত্রালয় থেকে উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ হজম করে ফেলা হতো।

দুই ঃ কোনো নারী নিজের অর্থ-সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারলেও পুরুষরা তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দিতো। যেন ধন-সম্পদ বাইরে না যায়।

তিন ঃ কোনো কোনো সময় স্ত্রীর কোনো দোষ না থাকলেও শুধু স্বভাবগত কারণে স্বামী তাকে অপসন্দ করতো, আবার তাকে তালাক দিয়ে মুক্তও করতো না ; যেন শেষ পর্যন্ত অতীষ্ঠ হয়ে প্রদত্ত টাকা ফেরত দেয় অথবা মোহরানা ক্ষমা করে দেয়।

চার ঃ কখনো কখনো স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়েও তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিতো না। যেন প্রদত্ত মোহরানা ফেরত দেয় অথবা আদায়যোগ্য মোহরানা ক্ষমা করে দেয়।

পাঁচ ঃ কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর ওয়ারিশরা বিধবাকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিতো না।

আল কুরআন এসব নির্যাতনের প্রতিকার কল্পে ঘোষণা করেছে, তোমাদের জন্যে এটা মোটেই হালাল নয় যে, তোমরা বলপ্রয়োগে নারীদের মালিক হয়ে বসবে।

আলোচ্য আয়াতে كَرْهًا (কার্‌হান্‌) বা 'জোরপূর্বক' কথাটিকে শর্ত হিসেবে বলা হয়নি। কারণ, তখন অর্থ হবে নারীদের সম্মতিতে তাদেরকে নিজের মালিকানাধীন করে নেয়া ঠিক হবে। শরীয়তসম্মত ও যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া নারীদের মালিক হয়ে যাওয়াটাই মূলতঃ তাদের বলপ্রয়োগে নিজের মালিকানাধীন করে নেয়ার সামিল। কোনো বুদ্ধিমতি, জ্ঞানী ও প্রকৃতিস্থ নারী এতে সম্মত হতে পারে না। কোনো নারী নির্বুদ্ধিতা বশত কারো মালিকানাধীন হতে রাজী হলেও ইসলামী আইন একে মোটেই স্বীকার করে না যে, কোনো স্বাধীন মানুষ কারো মালিকানাধীন চলে যাবে।

আয়াতে "তোমরা স্ত্রীদের মালিক হয়ে বসো না"–এভাবে সরাসরি নিষেধ আরোপ না করে বলা হয়েছে, 'জোরপূর্বক স্ত্রীদের উত্তরাধিকার হয়ে বসা মোটেই হালাল নয়।" এতে করে ব্যাপারটির কঠোরতা প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং যদি কেউ কোনো প্রাপ্ত বয়স্কা নারীকে তার সম্মতি ও অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে তবে এ বিয়ের দ্বারা উভয়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয় না

৮—

আর তাতে উত্তরাধিকার স্বত্ব ও বংশের বিধানাবলীও কায়েম হয় না। তেমনিভাবে কেউ যদি জোর করে তার স্ত্রী থেকে প্রদত্ত মোহরানা ফেরত গ্রহণ করে কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা মাফ করিয়ে নেয়, তবে এ জোরপূর্বক ফেরত গ্রহণ ও মাফ শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে গ্রহণকৃত অর্থ-মাল স্বামীর জন্যে হালাল হয় না এবং কোনো প্রাপ্যও মাফ হয় না। অবশ্য স্ত্রী যদি ব্যভিচার ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করে আর পুরুষ সে জন্যে বাধ্য হয়ে তালাক দিয়ে দেয়, তবে স্ত্রীর দোষের কারণে মোহরানা ফেরত গ্রহণ বা নির্ধারিত মোহরানা মাফ করানো পর্যন্ত স্ত্রীকে বিবাহে আবদ্ধ রাখার অধিকার স্বামীর রয়েছে। তবে সেটা নির্ধারণ করবে কোনো ইসলামী আদালত। কোনো ব্যক্তি নিজে ব্যক্তিগতভাবে করলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে না।

বিয়াল্লিশ

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○ وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○ (النساء : ٢٠ - ٢١)

"তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও আর তাদের একজনকে প্রচুর অর্থ-সম্পদও দিয়ে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গুনাহর মাধ্যমে গ্রহণ করবে? তোমরা কিভাবে তা গ্রহণ করতে চাও? অথচ তোমাদের একজন অন্যজনের কাছে গমন করেছ, আর তারা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিও গ্রহণ করেছে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২০-২১)

স্ত্রীদের দেয়া অর্থ-সম্পদ ফেরত নেয়া অন্যায় ও প্রকাশ্য গুনাহ

আলোচ্য আয়াতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রকৃতপক্ষে কোনো দোষ ছাড়াই যদি স্বামী নিছক নিজের বাসনা চরিতার্থ করার মানসে বর্তমান স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়, এমতাবস্থায় যদি সে অগাধ অর্থ-সম্পদও তাকে দিয়ে থাকে, তবে তালাকের বিনিময়ে তার কোনো অংশ ফেরত নেয়া কিংবা আদায়যোগ্য দেনা মাফ করানো স্বামীর জন্যে হারাম। কারণ এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর তো কোনো দোষ নেই। তাছাড়া মোহরানা ওয়াজিব হওয়ার কারণও পূর্ণতা লাভ করেছে। অর্থাৎ বিয়েও হয়েছে আবার উভয়ের মিলনও হয়েছে।

আয়াতের শেষার্ধে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার থেকে প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ ফেরত গ্রহণ যে কতবড় যুলুম ও গুনাহর কাজ তা তিনটি পর্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম পর্যায় বলা হয়েছে ঃ

اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا -

"তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গুনাহর মাধ্যমে গ্রহণ করবে ?" অর্থাৎ তোমরা যদি স্ত্রীর প্রতি অশোভন আচরণ ও ব্যভিচারের অপবাধ আরোপ করে প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ ফেরত নিতে পথ বের করতে চাও ? এ পর্যায়েও দু'টো অবস্থা হতে পারে ঃ এক. স্ত্রীর অশোভন কাজ বা ব্যভিচার করার মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করিয়ে তাকে প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ ফেরত নেয়ার ফঁন্দি আঁটা। দুই. মুখে তার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ না করেও অর্থ-সম্পদ ফেরত নেয়া, যা মূলতঃ অপবাদ দেয়ারই একটা রূপ। উভয় অবস্থাতেই তা উক্ত আয়াতাংশের অন্তর্ভুক্ত ; প্রতারণা তথা অন্যায় ও প্রকাশ্য গুনাহর শামিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ-

"তোমরা কিভাবে তা ফেরত নিতে চাও ? অথচ তোমরা পরস্পর মিলিত হয়েছ !" কারণ, বিয়ের পর পরস্পর মিলিত হলে স্ত্রীকে দেয়া সমস্ত অর্থ-সম্পদের মালিকানা স্ত্রীরই হয়ে যায়, স্বামীর তা ফেরত নেয়ার কোনো অধিকারই বাকী থাকে না। এ ক্ষেত্রে প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ যদি মোহরানা হয়ে থাকে তবে তা তো সম্পূর্ণ স্ত্রীরই অধিকার ও মালিকানা। স্বামীর হস্তক্ষেপের কোনো অধিকারই থাকে না। আর যদি প্রদত্ত সম্পদ ও অর্থ উপঢৌকন হয়ে থাকে, তবে তাও ফেরত নেয়া শরীয়তে জায়েয নেই, আইনতও তা কার্যকর হবে না।

তৃতীয় পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا .

"আর স্ত্রীরা তোমাদের থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে।" এখানে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি বলতে 'বিবাহ বন্ধন' বুঝানো হয়েছে। এ প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকারের দৃঢ়তা এজন্যে যে তা আল্লাহর নামে খুতবা পাঠ করে জনসমক্ষে স্বীকার করা হয়েছে। বস্তুত বিবাহ বাঁধন এমন মযবুত ও নির্ভরযোগ্য বাঁধন যার দৃঢ়তার উপর ভরসা করেই স্ত্রীরা একজন পুরুষের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেয়। অতপর পুরুষ যদি স্বেচ্ছায় সেই বাঁধন ছিন্ন করে তবে পাকা প্রতিশ্রুতির সময় স্ত্রীকে প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ স্বামীর ফেরত নেয়ার কোনো অধিকারই থাকে না।

মোটকথা, বৈবাহিক অঙ্গীকার ও পরস্পর মিলনের পর স্ত্রীকে প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ ফেরতদানের জন্যে স্ত্রীকে বাধ্য করা বা সে জন্যে যে কোনো কৌশল-ফঁন্দি আঁটা প্রকাশ্য যুলুম ও সম্পূর্ণ হারাম।

তেতাল্লিশ

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ط وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ০(النساء : ٢٢)

"তোমরা সেসব স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে না যাদের বিবাহ করেছে তোমাদের বাপ-দাদারা। অবশ্য পূর্বে এরূপ কিছু হয়ে থাকলে তা ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই তা খুবই নির্লজ্জ ও ঘৃণ্য এবং অত্যন্ত খারাপ পথ।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ২২)

পূর্ব পুরুষ ও অধস্তন পুরুষের স্ত্রীদের বিয়ে করা হারাম

জাহেলী যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে পুত্ররা নির্দ্বিধায় বিয়ে করে নিত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এ নির্লজ্জ কাজটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ একে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ বলে অভিহিত করেছেন। এতো এক কুরুচী ও কুস্বভাবের কাজ। দীর্ঘদিন যাকে মা বলে সম্বোধন করা হয়ে আসছে, পিতার মৃত্যুর পর তাকে স্ত্রী করে রাখা মানব চরিত্রের জঘন্যতম অপমৃত্যু ছাড়া আর কি হতে পারে?

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা ঐ নারীকে বিয়ে করো না যাদেরকে তোমাদের পিতা, দাদা, নানা বিয়ে করেছেন। তবে অতীতে এমন কিছু হয়ে থাকলে তা ধর্তব্য নয়। ভবিষ্যতে যেন এমনটি কিছুতেই না হতে পারে। নিশ্চয়ই এ কাজটি যুক্তির দিক থেকে অশ্লীল, সুস্থ বিবেকের লোকের পরিভাষায় অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং শরীয়তের আইনেও নেহায়াত মন্দ পথ।

আয়াতে اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ। "অবশ্য পূর্বে এরূপ কিছু হয়ে থাকলে তা ভিন্ন কথা"—তাফহীমুল কুরআনে বলা হয়েছে "এর দু'টো অর্থ হতে পারে—প্রথমতঃ অজ্ঞতা বা মূর্খতার সময়ে তোমরা যে ভুল-ভ্রান্তি করেছিলে তা ধর্তব্য হবে না যদি আল্লাহর বিধান নাযিলের পর তোমরা নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে লও এবং ভুল কাজ পরিত্যাগ কর। দ্বিতীয়তঃ পূর্বের কোনো কাজকে বর্তমানে হারাম ঘোষণা করা হলে তার মানে এ নয় যে, পূর্বের প্রচলন বা অতীত আইনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়,

পূর্বে যারা সৎমাকে বিবাহ করার কারণে তাদের ঔরসে যে সন্তানের জন্ম হয়েছিল তাকে অবৈধ ঘোষণা করা হবে না। কারণ সে কাজটি ছিল মূর্খতার কারণে অথবা শরীয়তের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে।"

তাফহীমুল কুরআনে আরও বলা হয়েছে, 'ইসলামী আইনে এটা ফৌজদারী অপরাধ বিশেষ এবং পুলিশের সরাসরি হস্তক্ষেপের উপযোগী ব্যাপার। আবু দাউদ, নাসায়ী ও মুসনাদে আহমাদের সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম (সা) এমন অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আর সাথে সাথে তাদের সমস্ত সম্পত্তি (সরকার কর্তৃক) বাজেয়াপ্ত করার শাস্তিও দিয়েছেন। ইবনে মাযাহ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় নবী করীম (সা) মূলনীতি স্বরূপ বলেছেন ঃ

مَنْ وَقَعَ عَلٰى ذَاتِ مُحْرِمٍ فَاقْتُلُوْهُ -

"যে ব্যক্তি মুহাররাম আত্মীয়ার সাথে ব্যভিচার করে তাকে হত্যা কর।"

ইমাম আহমদ (র)-এর মতে এ অপরাধীকে হত্যা করা ও তার ধন-সম্পত্তি ক্রোক করা আবশ্যক। ইমাম মালেক (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে তাকে ব্যভিচারির শাস্তি দিতে হবে।

আল্লামা ইবনে কাসীরের একটি বর্ণনায় তাফহীমুল কুরআনের উপরিউক্ত বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়। তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে, কিনানা ইবনে খুযাইমা স্বীয় পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছিল, সেই সূত্রে নযর ইবনে কিনানার জন্ম হয়েছিল। এ নযর ইবনে কিনানা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মন্তব্য হলো, সে তো মাতা-পিতার বৈধ মিলনের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে—ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়। এ থেকে বুঝা যায় এ প্রথা পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল আর তখন একে বৈধ বিবাহ বলে গণ্য করা হতো। প্রকৃতপক্ষে إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ "অবশ্য পূর্বে এরূপ কিছু হয়ে থাকলে তা ভিন্ন কথা"—এ বাক্যের ব্যাখ্যায় তাফহীমুল কুরআনে বর্ণিত দু'টো অর্থ তাফসীরে ইবনে কাসীরের উপরিউক্ত আলোচনার সাথে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে।

আতা ইবনে আবু রিবাহ (র) বলেন ঃ مَقْتًا শব্দের তাৎপর্য হলো এটা আল্লাহর রুচী বিরুদ্ধ আর سَاءَ سَبِيْلًا অর্থাৎ "রীতিনীতির দিক থেকে এটা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম রীতি।"

চুয়াল্লিশ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ لا وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ ـ(النساء : ٢٣)

"তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাইঝি, ভাগ্নী, আর তোমাদের সেসব মা—যারা তোমাদের দুধ খাওয়ায়েছেন, তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের কন্যা—যারা তোমাদের কোলে লালিত পালিত হয়েছে, সেসব স্ত্রীর কন্যারা যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। অবশ্য যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে থাকে তবে তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না, আপন ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীগণ, তাছাড়া দুই সহোদরা বোনকে একত্রে বিবাহ করাও (তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে।)"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৩)

যে ১৪ প্রকার মহিলাকে বিয়ে করা হারাম

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, সাত প্রকারের মহিলা বংশগত কারণে আর সাত প্রকারের মহিলা বৈবাহিক সূত্রের কারণে বিবাহ করা হারাম হয়েছে। একথা বলে তিনি উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেছেন।

উপরোক্ত আয়াতে তোমাদের 'মা' বলতে কেবল গর্ভধারিণী মাকেই বুঝায় না, বরং সাথে সাথে দাদী, নানীও اُمَّهٰتُ শব্দের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তেমনিভাবে بَنٰتُكُمْ তোমাদের কন্যা বলতে স্বীয় ঔরষজাত কন্যা, কন্যার কন্যা ও পুত্রের কন্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। اَخَوٰتُكُمْ মানে তোমাদের সহোদরা বোন। তেমনি বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয় বোনকেও বিয়ে করা হারাম। عَمّٰتُكُمْ মানে তোমাদের ফুফু। অর্থাৎ পিতার সহোদরা বৈমাত্রেয়া বৈপিত্রেয়া–তিন প্রকারের ফুফুকেই

বিয়ে করা হারাম। خَلٰتُكُمْ খালাগণ। এখানেও মায়ের তিন প্রকার বোন অন্তর্ভুক্ত। بَنٰتُ الْاَخِ ভাইয়ের কন্যা বলতেও তিন প্রকার ভাইয়ের কন্যাকে বুঝাবে بَنٰتُ الْاُخْتِ বোনের কন্যাও ঐ তিন প্রকার বোনের কন্যা বুঝাবে।

যেসব মহিলার দুধ পান করা হয়েছে। তারা গর্ভধারিণী মা না হলেও মায়ের পর্যায়ভুক্ত বিধায় তাদের বিয়ে করা হারাম। এ দুধপান একবার হোক বা একাধিকবার হোক আর দুধ কম পান করুক অথবা বেশী পান করুক সর্বাবস্থায় দুধ মাকে বিয়ে করা হারাম। ফিক্হ শাস্ত্রের পরিভাষায় এ হারাম হওয়াকে حُرْمَتِ رِضَاعَةٌ "হুরমতে রাদায়াত" বলে।

দুধ পান বলতে কেবল শিশুকালীন দুধ পান করাকেই বুঝাবে। ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে সেই সময় হলো শিশুর বয়স যখন আড়াই বছর পর্যন্ত থাকে। সুতরাং শিশুর বয়স আড়াই বছরের মধ্যে সে যেই মহিলার দুধ পান করবে তার সাথে সেই শিশুর বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় বিয়ে জায়েয নেই। কোনো বালক-বালিকা যদি উক্ত বয়সের পরে কোনো স্ত্রীলোকের দুধ পান করে, তবে এতে হুরমতে রাদায়াত বা দুধ পানজনিত অবৈধতা প্রমাণিত হবে না।

সকল প্রকার দুধ বোনকে বিয়ে করা হারাম। বংশগত সম্পর্কের কারণে যাদের বিয়ে করা হারাম হয়ে যায়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণেও সেসব লোকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম হয়ে যায়। হাদীস শরীফে আছে ঃ

يحرم من الرضاعة مايحرم من الولادة

ان الله حرم من الرضاعة ماحرم من النسب

"দুধ পানে বিয়ে হারাম হয়, যারা জন্মের কারণে হারাম হয়।"

"আল্লাহ তা'আলা দুধ পানে হারাম করেছেন যাদের বংশের কারণে হারাম করেছেন।"

স্ত্রীদের মাতা অর্থাৎ শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করা হারাম। তেমনি স্ত্রীদের দাদী, নানী, বংশগত ও দুধ গত সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

যে মহিলাকে বিয়ে করে সহবাস করেছে সেই মহিলার অন্য স্বামীর ঔরষজাত কন্যা, পৌত্রী ও দৌহিত্রীও হারাম হয়ে যায়। তাদের কাউকে বিয়ে করা জায়েয নয়।

ঔরষজাত সন্তানের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম। এখানে ঔরষজাত পুত্রের মধ্যে পৌত্র ও দৌহিত্র সবাই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদের স্ত্রীকেও বিয়ে করা জায়েয নেই।

কিন্তু সন্তান বা পুত্র যদি ঔরসজাত না হয় অর্থাৎ পোষ্য বা পালক পুত্র হয়, তবে তার স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম নয়। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, দুধপুত্র বংশগত পুত্রের পর্যায়ভুক্ত, কাজেই তার স্ত্রীকেও বিয়ে করা হারাম।

দুই বোনকে একই সময় স্ত্রী হিসেবে রাখা হারাম। চাই তারা বংশগত হোক, দুধ পানজনিত হোক অথবা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় হোক। একজনের মৃত্যু বা তালাকের পর অন্য বোনকে বিয়ে করা জায়েয।

উপরের আয়াতের ১৩জন মহিলা এবং পরবর্তী আয়াতের একজন সহ (অন্যের স্ত্রী) মোট ১৪জন স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হারাম।

পঁয়তাল্লিশ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ

"আর সেসব নারীও তোমাদের জন্যে হারাম, যারা অন্য কারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। অবশ্য তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীগণ এর ব্যতিক্রম। এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর বিধান।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৪)

স্ত্রী গ্রহণ করার ব্যাপারে আল্লাহর মীমাংসা

যে চৌদ্দ প্রকার স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে উপরে তার তের প্রকারের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানে চৌদ্দতম প্রকারের মহিলার উল্লেখ করা হয়েছে ; আর তারা হচ্ছে অন্যের বিবাহে আবদ্ধ স্ত্রীলোক। প্রকাশ থাকে যে, পূর্ববর্তী আয়াতে ও এ আয়াতের প্রথমাংশে যে চৌদ্দ প্রকারের স্ত্রী লোককে বিবাহ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে (১) বংশের কারণে হারাম, (২) দুধ পানের কারণে হারাম, (৩) বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হারাম।–এ তিন কারণে হারাম ঘোষিত মহিলারা চিরদিনের জন্যে হারাম। এদের বলা হয় "মুহাররামাতে আবাদিয়া" مُحَرَّمَاتُ اَبَدِيَّةٌ বা চিরতরে হারাম। উক্ত চৌদ্দ প্রকারের নারীর মধ্যে শেষ দুই প্রকারের হারাম ঘোষিত মহিলা কোনো কোনো সময় হালাল হয়ে থাকে। যেমন, এক বোন বিবাহ বন্ধনে থাকা পর্যন্ত অপর বোন সেই ব্যক্তির জন্যে হারাম হলেও প্রথম বোন মারা গেলে অথবা তার সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে অপর বোনকে বিবাহ করা বৈধ। তেমনি পর স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত পর স্ত্রী থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে অন্য পুরুষ বিয়ে করতে না পারলেও সেই লোকের মৃত্যু অথবা সে তালাক দিলে ঐ মহিলাকে অন্য পুরুষ বিয়ে করতে পারে। সুতরাং চৌদ্দ প্রকারের শেষ দুই প্রকারের মহিলা "মুহাররামাতে আবাদিয়া" (চির হারাম) মহিলার অন্তর্ভুক্ত নয়।–(মা'আরেফুল কুরআন)

আয়াতে "অধিকারভুক্ত দাসী"গণকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি সম্পর্কে অধুনা এক শ্রেণীর মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যেও বিভ্রান্তি বিরাজ করছে।

যেসব স্ত্রীলোক যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বন্দী হয়ে আসে আর তাদের কাফের স্বামী যদি দারুল হরবে (বা কাফের শত্রু দেশে) থেকে যায়, তবে সেসব স্ত্রীলোককে

গ্রহণ করা হারাম নয়। কেননা দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে চলে আসার কারণে তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। এ ধরনের স্ত্রীলোকদের বিবাহ করা যেতে পারে, কারো মালিকানাধীন দাসী হিসাবে থাকলে তার সাথে সঙ্গমও করা যেতে পারে। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ই একত্রে বন্দী হয়ে আসলে তাদের ব্যাপারে ফিকহবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (র) ও তাঁর শিষ্যদের মতে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে না।–(তাফহীমুল কুরআন)

দাসীর সাথে সংগম

অধিকারভুক্ত দাসীদের সাথে সঙ্গম করার বিষয়ে সৃষ্ট ভুল ধারণা নিরসনের জন্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ভাল করে বুঝে নেয়া দরকার।

(১) যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বন্দী হয়ে আসলেই তাদের সাথে কোনো লোক সঙ্গম করতে পারবে না। বরং তা হবে যিনার শামিল। ইসলামী শরীয়ত মতে এ জাতীয় মহিলারা (ইসলামী) সরকারের অধীন থাকবে। আর সরকার ইচ্ছা করলে তাদের স্বাধীন করে দিতে পারে। বিনিময় মূল্য নিয়ে রেহাই দিতে পারে, শত্রু পক্ষের হাতে বন্দী মুসলমানের সাথে বিনিময় করতে পারে। তাছাড়া মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করার ইখতিয়ার (ইসলামী) সরকারের আছে। মূলত একজন সৈনিক কেবলমাত্র সেই বন্দী স্ত্রীলোকের সাথেই সঙ্গম করতে পারে, যাকে সরকার যথারীতি তার মালিকানায় ছেড়ে দিয়েছে।

(২) এরূপ শরীয়ত সম্মত উপায়ে মালিকানাধীন স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে হলেও ইদ্দত পালনের পরই তা বৈধ হতে পারে। অর্থাৎ একবার মাসিক ঋতু হওয়া বা তার গর্ভ ধারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল তা বৈধ।

(৩) এরূপ বন্দী নারীর আহলে কিতাব হওয়া শর্ত নয়, বরং যে কোনো ধর্মের নারীর সাথে সঙ্গম জায়েয।

(৪) যার মালিকানাধীন বণ্টন করে দেয়া হয়েছে সে ছাড়া অন্য কেউ তার সাথে সঙ্গম করতে পারবে না।

(৫) এ মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য।

(৬) সরকার কারো মালিকানায় সপর্দ করার পর পুনরায় তাকে ফেরত নেয়ার অধিকার সরকারের থাকবে না।

(৭) কোনো সেনাধ্যক্ষ এরূপ মহিলাকে তার কোনো সৈনিকের কাছে যৌন লালসা চরিতার্থ করতে দিলে তা ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ না-জায়েয

কাজ হবে। এটা প্রকাশ্য যিনা বা ব্যভিচারের শামিল। (অধিক জানার জন্যে মাআরেফুল কুরআন ও তাফহীমুল কুরআন দেখুন।)

কোনো মহিলা যদি দারুল হরবে মুসলমান হয়ে যায় আর তার স্বামী কাফের থাকে তবে শরীয়তের বিচারক তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলবে। সে তা অস্বীকার করলে বিচারক তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবে। এ বিচ্ছেদ তালাক বলে গণ্য হবে।–[মা'আরেফুল কুরআন ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)]

একজন মহিলা একই সময় একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না

অধুনা মূর্খ ধর্মদ্রোহী ও ইসলাম বিদ্বেষীদের মতে একজন পুরুষ যেমন একাধিক নারী গ্রহণ করতে পারে, একজন নারীরও তেমনি একাধিক স্বামী গ্রহণের অধিকার থাকা চাই। তাদের এ দাবী আলোচ্য আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তারা একথাটি বুঝে না যে, পুরুষের জন্যে একাধিক বিবাহ একটা নিয়ামত ও সামাজিক শৃংখলার চাবিকাঠি। এটা প্রত্যেক ধর্মেই স্বীকৃত এবং ঐতিহাসিক সত্য। পক্ষান্তরে একজন নারীর জন্যে একাধিক স্বামী স্বয়ং নারীর জন্যেই বিপদের কারণ, আর তা স্বামীদের জন্যেও নির্লজ্জতা এবং সামাজিক বিপর্যয়ের উৎস। কোনো সমাজে এ নীতি চালু থাকলে তা আর মানুষের সমাজ থাকে না। এতে মানব বংশ এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে বাধ্য। আজকের পাশ্চাত্যই তার উজ্জ্বলতম সাক্ষী।

স্বভাব-প্রকৃতি আর সাধারণ যুক্তিতেও এমন নারীর জন্যে একাধিক স্বামী থাকার কোনো বৈধতা দেখা যায় না। কারণ, বিয়ের বুনিয়াদী লক্ষ্য হলো বংশ বিস্তার ও সামাজিক শৃংখলা সংরক্ষণ। একজন পুরুষ দ্বারা তো একাধিক মহিলা গর্ভধারণ করতে পারে ; কিন্তু একজন নারী একাধিক পুরুষ দ্বারা গর্ভবতী হতে পারে না। সে তো গর্ভধারণ করে একজন থেকেই। তাই একাধিক স্বামীর অবশিষ্ট সব স্বামীর শক্তি বিনষ্ট হবে, কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ ছাড়া তাদের কোনো কাজ থাকবে না। দ্বিতীয়ত সৃষ্টিগতভাবেই নারী অবলা এবং অনেক সময় সে থাকে স্বামীর সহবাসের অযোগ্য। কোনো কোনো সময় একজন স্বামীর হক আদায় করাও তার দ্বারা সম্ভব হয় না। একাধিক স্বামীর তো প্রশ্নই উঠে না। তৃতীয়ত সাধারণ পুরুষ নারীর তুলনায় অধিক শক্তিশালী। এমতাবস্থায় কোনো স্বামীর যৌনশক্তি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী হলে সে একজন নারী দ্বারা সন্তুষ্ট হতে পারে না। তখন তার আরেকজন স্ত্রী না থাকলে সে অবৈধ পথে গিয়ে গোটা সমাজকে দুষিত করে ছাড়বে। কিন্তু নারী দ্বারা এমনটি হওয়ার আশংকা কম।–(মাআরেফুল কুরআন)

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ ط فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (النساء : ٢٤)

"উপরিউক্ত মহিলাগণ ছাড়া তোমাদের সকল নারী হালাল করা হলো ; তোমরা তাদেরকে তোমাদের সম্পদের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহে আবদ্ধ করার জন্যে—যৌন কামনা চরিতার্থ করার জন্যে নয়। অতপর এতে করে তাদের দিয়ে দাম্পত্য জীবনের যে স্বাদ তোমরা লাভ করবে সে জন্যে তাদেরকে তাদের পাওনা (মোহরানা) ফরয হিসেবে আদায় করবে। অবশ্য মোহরানা নির্ধারণের পর পারস্পরিক সন্তুষ্টি সহকারে যদি তোমাদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহাবিজ্ঞানী।"—(সূরা আন নিসা ঃ ২৪)

বিবাহে মোহরানা নির্ধারণ করা ফরয

পূর্বোক্ত আয়াতে (চুয়াল্লিশ ও পঁয়তাল্লিশ ক্রমিকে) বর্ণিত নির্দিষ্ট মহিলাদের ছাড়া বাকী মহিলাদের মধ্য হতে মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে করার হুকুম এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ওসব নারীগণ ছাড়া বাকীসব নারী তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। যেমন চাচার কন্যা, খালার মেয়ে, মামাত বোন, মামা ও চাচার স্ত্রী তাদের মৃত্যুর পর—যদি তারা অন্য কোনো সম্পর্ক দ্বারা হারাম না হয়। আর পালক পুত্রের স্ত্রী—যদি সে তাকে তালাক দিয়ে দেয়, কিংবা সে মারা যায়, স্ত্রী মারা গেলে তার বোন ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারের মহিলাই مَاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ -এর অন্তর্ভুক্ত।

তবে কুরআনের অন্য আয়াতে চারজনের অধিক সংখ্যক নারীকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বোচ্চ চারজনকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখা যেতে পারে। আয়াত থেকে বুঝা গেল মোহরানা ছাড়া বিবাহ হতে পারে না। এমনকি স্বামী-স্ত্রী উভয় যদি মোহরানা ছাড়া বিবাহে সম্মত হয়, তবুও মোহরানা অবশ্যই আদায় করতে হবে। তবে বিবাহের আকদ হওয়ার সময় যদি মোহরানার পরিমাণ উল্লেখ না করা হয়ে থাকে তবুও বিবাহ কার্যকর হয়ে

যাবে। আর সে অবস্থায় 'মোহরে মেছেল' ওয়াজিব হবে। কোনো অবস্থাতেই বিবাহ্ মোহ্রানা ছাড়া জায়েয হবে না। অবশ্য মোহ্রানা আদায়ের ব্যাপারে স্ত্রীর পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। সে ইচ্ছা করলে কোনো প্রকার চাপ ছাড়া স্বেচ্ছায় মোহরানা আংশিক বা সম্পূর্ণ মাফ করে দিতে পারে। মাহ্রে মেছেল' বলতে মেয়ের অন্যান্য বোন, ফুফু, চাচাত, জেঠাতো বোনদের মাহ্রের সমপরিমাণ মোহ্রানা বুঝায়।

এ আয়াতে اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ (তোমাদের সম্পদের বিনিময়ে তলব করবে) বলে বুঝানো হয়েছে যে, বিবাহের উদ্দেশ্যে মহিলাদের সন্ধান কর তোমাদের সম্পদ তাদের মোহ্রানা হিসেবে দিয়ে (বায়যাবী)। অর্থাৎ মোহ্রানা প্রদান করে বিবাহ্ কর। ফকীহ্গণ এ আয়াত থেকে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, 'মোহ্রানা' বিবাহের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ বা উপাদান, তার পরিমাণ নির্দিষ্ট হোক বা না-ই হোক।

এ আয়াত থেকে প্রমাণ হয় 'মোহ্রানা' ছাড়া বিবাহ্ অনুষ্ঠিত হতে পারে না। তা অপরিহার্য, চাই তার পরিমাণ নির্দিষ্ট হোক বা না-ই হোক।–(মাদারিক)

মোহ্রানার উপর্যুপরি তাকীদ থেকে প্রতিভাত হয় যে, নারীদের অধিকার সংরক্ষণে যত্নবান হওয়া ইসলামী আইনে কতটা বাঞ্ছনীয়। মূল আর্থিক ব্যয় বিবাহ্ এবং যিনা উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন। পার্থক্য এই যে, বিবাহের দ্বারা জীবনটা মানুষের মত সুশৃংখল ও অনুগত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যিনার দ্বারা মানুষ পশুর মত হীন পর্যায়ে উপনীত হয়।

আয়াতে বিবাহের জুড়ি তালাসের জন্য পুরুষকে সম্বোধন করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেন বিবাহের প্রস্তাবটা হবে পুরুষের কাজ আর গ্রহণ বা অনুমোদন করা হবে নারীর কাজ।–(তাফসীরে মাজেদী)

সাতচল্লিশ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ط بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ع

"আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীকে বিয়ে করবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফ আছেন। তোমরা সবাই মূলত একই বংশীয়।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৫)

বিয়ে করবে স্বাধীন মুসলিম নারীকে

একজন মুসলিম বিয়ে করবে একজন স্বাধীন সম্ভ্রান্ত মুসলিম মহিলাকে। কিন্তু কেউ যদি সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলিম পাত্রী (মুহসানাত)-কে বিয়ে করার পুরো সামর্থ না রাখে, তবে সে নিজেদের মধ্যকার শরীয়তসম্মত মালিকানাধীন দাসীদের বিয়ে করবে। কেননা অধিকাংশ দাসীর মোহরানা ও খরচাদি কম হয়ে থাকে এবং তাদের গরীবের ঘরে বিয়ে দিতে সংকোচ করা হয় না। আর দাসীকে বিয়ে করতে কোনো পুরুষের সংকোচ করাও উচিত নয়। কেননা ধার্মিকতা ও ঈমানদারীর দিক থেকে একজন দাসী একজন স্বাধীন নারীর চেয়েও উত্তম হতে পারে। ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিই হলো ঈমান ও তাকওয়া। তোমাদের মধ্যে ঈমানের দিক থেকে কে শ্রেষ্ঠ আর কে নিকৃষ্ট, তা কেবল আল্লাহই ভাল জানেন। কারণ এটা তো অন্তরের সাথেই সম্পৃক্ত, আর অন্তরের পূর্ণ খবর তো আল্লাহরই ভাল জানা আছে। পার্থিব দিক থেকে সংকোচের বড় কারণ হচ্ছে বংশগত পার্থক্য থাকা অথচ বংশের মূল উৎস হলেন হযরত আদম ও হাওয়া (আ)। উৎসের অভিন্নতার কারণে তোমরা সবাই পরস্পর সমান, সবাই একই বংশোদ্ভূত। সুতরাং সংকোচের কোনো কারণ থাকা মোটেই সমীচীন নয়।

অবশ্য আয়াতের ভাষ্যে বলা হয়েছে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার অর্থ সামর্থ না থাকলে ঈমানদার দাসীদের বিয়ে করা যায়। সুতরাং যথাসম্ভব স্বাধীন নারীকেই বিয়ে করার চেষ্টা করতে হবে। আর যদি দাসীদেরই বিয়ে করতে হয়, তবে ঈমানদার দাসী খোঁজ করতে হবে। হযরত ইমাম আবু হানিফা (র)-

এর মত এটাই। তাঁর মতে স্বাধীন সম্ভ্রান্ত মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও দাসী কিংবা ইয়াহুদী খৃষ্টান দাসীকে বিয়ে করা মাকরূহ। ইমাম শাফিঈ (র) ও অন্যান্য ইমামের মতে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও দাসীকে অথবা ইয়াহুদী খ্রীষ্টান দাসীকে বিয়ে করা সর্বাবস্থায় অবৈধ। চিন্তাশীল উলামায়ে কিরামের মতে স্বাধীন ইয়াহুদী-খ্রীষ্টান নারীকে বিয়ে করা বৈধ হলেও তা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। বর্তমান যুগে এর গুরুত্ব অত্যধিক।-(মাআরেফুল কুরআন)

আয়াতে বলা হয়েছে, "স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করার সামর্থ না থাকলে দাসী ঈমানদার মহিলাকে বিয়ে করবে।" সুতরাং মুতাআ বৈধ নয়। কারণ, স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ না থাকা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যে মুতাআ ছিল সহজতম পথ। এতে যৌন বাসনারও পরিতৃপ্তি হতো এবং আর্থিক বোঝাও বিয়ের তুলনায় অনেক কম হতো। অথচ আল্লাহ তা'আলা স্বাধীন নারীকে বিবাহ করতে অসমর্থ হলেও মুতাআর অনুমতি দেননি। কাজেই মুতাআ সর্বাবস্থায় হারাম।

আটচল্লিশ

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○(النساء : ٢٥)

"তাদেরকে (দাসীদেরকে) তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং যথাবিধি তাদের মোহরানা আদায় কর। এমতাবস্থায় যে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে—ব্যভিচারীণী কিংবা উপপতি গ্রহণকারিণী হবে না। অতপর তারা যখন বিবাহ বন্ধনে এসে যায় তখন যদি কোনো অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদেরকে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ হুকুম তাদের জন্য, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকা করে। আর সবর করাই তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৫)

সম্ভ্রান্ত স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করার সামর্থ না থাকলে সবর করাই উত্তম

কোনো পুরুষ সম্ভ্রান্ত স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করতে সমর্থ না হলে এবং তার ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকা থাকলে, সে মুসলিম দাসী নারীকে বিয়ে করবে। কিন্তু তার জন্যে উত্তম যৌন সংযম অবলম্বন করা এবং সামর্থ হওয়ার অপেক্ষায় থাকা, যেন সে একজন স্বাধীন নারীকে বিয়ে করতে পারে। কেউ যদি যৌন সংযমে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও দাসী নারীকে বিয়ে করে বসে, তবে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন না, তাকে ক্ষমা করবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল করুণাময়।

দাসী বিয়ে করলে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে উক্ত আয়াতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। (১) মালিকদের অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে করতে হবে, অন্যথা বিয়ে শুদ্ধ হবে না। কারণ, দাসীদের নিজের উপরও কোনো

কর্তৃত্ব নেই। গোলামের অবস্থাও অনুরূপ, সে প্রভুর অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতে পারবে না। (২) তাদের বিয়ে করতে হবে উত্তম পন্থায় মোহ্রানা আদায় করে দিয়ে। কোনো প্রকার টালবাহান করা, পুরোপুরি আদায় না করা কিংবা দাসী ভেবে কোনো প্রকার কষ্ট দেয়া যাবে না। (৩) তারা যেন সতী-সাধ্বী হয়, প্রকাশ্য ব্যভিচারিণী বা গোপন সম্পর্ক স্থাপনকারী না হয়। এমনকি স্বাধীন ব্যভিচারিণী নারী থেকেও বেঁচে থাকা উত্তম।

দাসী নারীদের বিয়ে হওয়ার পর যদি তাদের সতী-সাধ্বী থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। তখনও যদি তারা যিনা করে বসে, তবে তারা স্বাধীন যিনাকারী নারীগণের নির্ধারিত শাস্তির অর্ধেক ভোগ করবে। এখানে অবিবাহিতা স্বাধীন নারীকে বুঝানো হয়েছে। অবিবাহিত স্বাধীন পুরুষ বা নারী যিনা করলে তাদের একশত বেত্রাঘাত করার বিধান রয়েছে।

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ অর্থাৎ দাসীদের বিয়ে করার অনুমতি ঐ ব্যক্তির জন্য যার যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে। সুতরাং যিনায় লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকা না থাকলে দাসী বিয়ে করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য তবুও কেউ করে ফেললে তো আল্লাহর অনুমতি রয়েছেই।

সর্বশেষে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা হলো, যিনার আশংকা থাকা সত্ত্বেও সবর করা এবং নিজেকে পবিত্র ও সৎ রাখতে পারা দাসীকে বিয়ে করার চেয়ে উত্তম। যারা বিয়ে করার সামর্থ রাখে না, খোরপোষ দেয়ার মত যাদের আর্থিক সচ্ছলতা নেই তাদের উচিত সবর করা এবং নিজেকে সৎ ও পবিত্র রাখা। আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করা।

ঊনপঞ্চাশ

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○ (النساء : ٣٢)

"তোমরা এমন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করো না যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষরা যা অর্জন করে সেটা তাদের অংশ, আর নারীরা যা অর্জন করে সেটা তাদের অংশ। আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩২)

পুরুষ পাবে তার অর্জিত অংশ আর নারী পাবে তার অর্জিত অংশ

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষকে এমন সব বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করতে নিষেধ করেছেন। যেসব বিষয়ে আল্লাহ নিজেই কাউকে দান করেছেন যেমন কারো পুরুষ হয়ে জন্ম হওয়া, কারো ধনী হওয়া, কারো সৈয়দ বংশে জন্ম হওয়া, কারো সুন্দর স্বাস্থ্যবান হওয়া–ইত্যাদি। এসব বিষয়ই মানুষের আয়ত্বের বাইরে আল্লাহর বিশেষ ইচ্ছায় এরূপ হয়ে থাকে।

আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়া প্রসংগে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত উম্মে সালমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যে, আমাদের নারীদের জন্য ওয়ারিশী সম্পত্তিতে পুরুষদের অর্ধেক নির্ধারিত হয়েছে। এমনি ধরনের আরো কতিপয় বিষয়ে নারীদের বেলায় বৈষম্য করা হলো কেন? তাঁর প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য আপত্তি উত্থাপন নয় বরং এ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা, "আমরাও যদি পুরুষ হতাম তবে তাদের মত আমাদের প্রাধান্য থাকত।" কোনো কোনো মহিলা আক্ষেপ করেছিলেন আমরাও পুরুষ হলে জিহাদে অংশগ্রহণ করে অধিক মর্যাদা লাভ করতে পারতাম। তাছাড়া জনৈক স্ত্রীলোক একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমরা ওয়ারিশী স্বত্বের অর্ধেক পাই, সাক্ষীর

বেলায়ও আমরা দু'জন নারী একজন পুরুষের সমান গণ্য হই। তাহলে কি আমরা আমাদের ইবাদাতের ফলও অর্ধেক পাব ? এসব প্রশ্নের জবাবে উপরের দুটো আয়াত নাযিল হয়েছে।

হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ বিশেষ হিকমতের কারণে কারো উপর কারো মর্যাদা দিয়েছেন, সে জন্য তোমরা অযথা মনক্ষুণ্ন হয়ো না। এটা আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল। এর রহস্য তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। এগুলো তো মানুষের আয়ত্বাধীন বিষয় নয়। সুতরাং এ জাতীয় বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা ও আল্লাহর শোকর করাই বাঞ্ছনীয়।

পুরুষরা তাদেরকে আল্লাহ পুরুষ বানানোর কারণে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে তেমনি নারীগণও তাদের নারী বানানোর কারণে আল্লাহর উপর রাজী থাকবে। অন্যথা উপরোক্ত অর্থহীন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে মানসিক যন্ত্রণা ছাড়া আর কোনো লাভ নেই।

অবশ্য মানুষের আয়ত্বাধীন যেসব বিষয় রয়েছে সেসব বিষয়ে চেষ্টা-সাধনা ও প্রতিযোগিতা করলেই সাফল্য লাভের আশা করা যেতে পারে। পরবর্তীতে لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا.......... বলে সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে পুরুষ যা অর্জন করে তা তার অংশ, আর নারী যা অর্জন করে তা তার অংশ। অর্থাৎ পুরুষগণ যাকিছু চেষ্টা-সাধনা করে অর্জন করবে তারা তার অংশ পাবে। আর নারীরা যাকিছু অর্জন করবে তার অংশ পাবে তারা।

এখানে ইংগিত করা হয়েছে যে, গুণ-বৈশিষ্ট্য ও কর্মদক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। প্রত্যেকেই তার প্রচেষ্টার ফল অবশ্যই লাভ করবে। নর-নারীর কোনো বিশেষ পার্থক্য এ ক্ষেত্রে মোটেই থাকবে না। আয়াত থেকে আরো শিক্ষণীয় যে, অপরের জ্ঞান-গরিমা ও চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য দেখে সেরূপ গুণ-বৈশিষ্ট্যের আকাঙ্ক্ষা করা বাঞ্ছনীয় ও প্রশংসনীয়। আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, কোনো চেষ্টাকারীর চেষ্টাই বৃথা যাবে না। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই নিজ নিজ চেষ্টা ও আমলের ফল পাবে।

وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ - "আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।" এ বলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি অন্যকে কোনো বিষয়ে তোমাদের চেয়ে সমৃদ্ধ দেখতে পাও, তবে তার সেটুকু কেড়ে নেয়ার অনর্থক

চেষ্টা করার পরিবর্তে তুমি নিজের জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের প্রার্থনা করতে থাক। কেননা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে বর্ষিত হতে থাকে। কারো প্রতি সেই অনুগ্রহ দেখা দেয় ধন-সম্পদের আকারে আর কারো প্রতি দেখা দেয় দারিদ্র আকারে। কেননা তা না হলে প্রথম ব্যক্তি হয়ত ঈমান হারা হয়ে পড়তো, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জড়িয়ে পড়তো নানা প্রকার গুনাহের কাজে। কার জন্য কোন্ বস্তু বা কোন্ অবস্থান উপকারী বা কল্যাণকর, তা একমাত্র সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলাই ভালভাবে জানেন এবং তিনি সেভাবেই মানুষের জন্য তাঁর অনুগ্রহের দরযা খুলে দেন। মানুষের মধ্যে কাউকে পুরুষ রূপে সৃষ্টি করা কাউকেও নারী রূপে সৃষ্টি করা তাঁর হিকমতের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

পঞ্চাশ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ط

"পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্যে যে আল্লাহ একের উপর অন্যের মর্যাদা দিয়েছেন আর এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সতী নারীগণ হয় অনুগত লোক চক্ষুর অন্তরালে ও সেসবের হেফাজত করে। যেসব কিছু আল্লাহ হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৪)

পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "আর পুরুষদের রয়েছে নারীদের উপর মর্যাদা। আয়াতে পুরুষদের প্রধান্যের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে বিশেষ ভংগিতে। পুরুষদের এ মর্যাদা নারীদের সামগ্রিক কল্যাণের বিষয় বিবেচনা করেই ব্যক্ত করা হয়েছে। এ প্রাধান্য নারীদের খাটো করা অথবা তাদের অধিকার খর্ব করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং তাদের দৈহিক, মানসিক ও স্বভাবগত অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এ ঘোষণা তো দিয়েছেন তিনি, যে সত্বা অত্যন্ত সুনিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন নর ও নারীকে। এখানে বলা হয়েছে, اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল বা দায়িত্বশীল। আরবীতে قَوَّامُ, قَيِّمُ ও قِيَام বলতে বুঝায় এমন ব্যক্তিকে যে কোনো কাজের পরিচালক, দায়িত্বশীল বা তত্বাবধায়ক। তাই এ আয়াতের তরজমা করা হয় পুরুষরা স্ত্রীলোকদের পরিচালক বা অভিভাবক। সাধারণত কোনো যৌথ কাজ কারবারের জন্য যেমন একজন পরিচালক বা অভিভাবকের প্রয়োজন, তেমনি পরিবার পরিচালনার জন্যও আবশ্যক একজন পরিচালক বা অভিভাবক। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব শিশু বা স্ত্রীলোকের উপর অর্পণ না করে, তা অর্পণ করেছেন পুরুষের উপর। কারণ, সৃষ্টিগত দিক থেকে সংসার জীবনের দৈনন্দিন কার্যাদি পরিচালনা ও এতদসংক্রান্ত সমস্যাদি

মুকাবিলা করার মানসিক যোগ্যতা ও দৈহিক ক্ষমতা শিশু ও নারীর তুলনায় পুরুষের অনেক বেশী।

ইসলাম পুরুষদের উপর নারীদের অধিকার ততটুকুই দিয়েছে, যতটুকু অধিকার পুরুষদের দিয়েছে নারীদের উপর। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস নারী-পুরুষের অধিকারের বেলায় পরস্পরের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। কিন্তু একটি বিষয়ে স্ত্রীর উপর দিয়েছে স্বামীর প্রাধান্য। আর তা হচ্ছে পরিবারে স্বামী হবে স্ত্রীর অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক ও দায়িত্বশীল। তবে আল কুরআন এ বিষয়ে সুস্পষ্ট করে ঘোষণা করেছে যে, এ অভিভাবকত্ব স্বৈরাচারমূলকভাবে প্রয়োগ করার অধিকার স্বামীর নেই। বরং এ অভিভাবকত্ব হবে শরীয়াতের বিধি-বিধান ও পারস্পরিক পরামর্শের নীতিমালার অধীন। স্বামী নিজের খেয়াল-খুশী মাফিক যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে না। বরং তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "স্ত্রীদের সাথে সমীচীন পন্থায় উত্তম আচরণের সাথে জীবন যাপন কর।" তেমনি আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ অর্থাৎ পরিবারিক ও সাংসারিক কাজকর্ম স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও পরামর্শের ভিত্তিতে আনজাম দেবে। কাজেই স্বামীর অভিভাবকত্ব জনিত প্রাধান্য স্ত্রীর জন্য কোনো প্রকার ক্ষোভ বা অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে না। বরং স্বামীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেয়ে তার দায়িত্ব পালন করার প্রতি অধিক জোর দেয়া হয়েছে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমার সর্বোত্তম স্ত্রী হবে সে যাকে তুমি দেখলে তোমার মন তৃপ্ত হবে, তাকে কোনো কাজের আদেশ করলে সে তা মেনে চলবে, আর তোমার অনুপস্থিতিতে সে তোমার সম্পদের ও তার নিজের হেফাজত করবে।

স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য, কিন্তু রাব্বুল আলামীন আল্লাহর দাসত্বের গুরুত্ব অনেক বেশী। সুতরাং কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে আল্লাহর নাফরমানীমূলক কোনো কাজের আদেশ করে অথবা নির্ধারিত ফরয পালনে বাধার সৃষ্টি করে, তবে স্বামীর সেই হুকুম পালন করতে অস্বীকার করা স্ত্রীর কর্তব্য। আল্লাহর কোনো নাফরমান অবাধ্য স্বামী যদি স্ত্রীকেও আল্লাহর নাফরমানী ও অবাধ্যতার কাজের প্রতি বাধ্য করে, তবে তাকে অমান্য করা স্ত্রীর ঈমানী দায়িত্ব। তখন যদি সে স্বামীর হুকুম পালন করে তবে সে গুনাহগার হবে। অবশ্য স্বামী কখনো কোনো নফল নামায-রোযা না করতে বললে, তা মেনে চলা স্ত্রীর কর্তব্য।

একান্ন

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ج

فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاO(النساء : ٣٤)

"আর যেসব নারীর মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর ; তাদের উপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর, তাদের (মৃদু) প্রহার কর। তারপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অজুহাত তালাশ করবে না।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৪)

অবাধ্য স্ত্রীকে সংশোধন করে নেয়ার নির্দেশ

যদি কখনো কোনো স্ত্রী থেকে অবাধ্যতা দেখা যায়, তবে তাকে সংশোধনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সে জন্যে এ আয়াতে তিনটি পর্যায় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত, তাকে স্বাভাবিকভাবে নরম সুরে উপদেশ সহকারে বুঝাতে থাকবে। যাতে করে সে তার ভুল, দোষ-ত্রুটি বুঝে উঠতে সক্ষম হয়। যদি এতে সে সংশোধিত না হয়ে তার পূর্বের অবস্থায় থেকে যায় বা দোষ থেকে বিরত না হয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তার থেকে পৃথক হয়ে রাত্রি যাপন করবে। এখানে বিছানা পৃথক করে দেয়ার নিয়ম বলে দেয়া হয়েছে—পৃথক ঘরে রাত যাপনের কথা বলা হয়নি। বিছানা পৃথক করে দিলে সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করতে পেরে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে। ঘর পৃথক করে দিলে যেমন তার মনে অধিক দুঃখ ও আঘাত লাগতে পারে। তেমনি কোনো অঘটনও ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অধিক।

একজন সাহাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের হক কি ? তিনি বললেন, তোমরা খেলে তাকেও খাওয়াবে, তুমি পরিধান করলে তাকেও পরতে দেবে, তার চেহারায় মারবে না। তার বদনাম করবে না, আর তার থেকে পৃথক থাকবে না, তবে একই ঘরে পৃথক থাকতে পার। বস্তুত যদি এত ভদ্রোজনোচিত শাসন এবং শাস্তিতেও সে সংশোধিত না হয়, তবে তাকে মৃদু প্রহার করার অনুমতি আছে। কিন্তু তার মুখের উপর মারা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রথম দু'টো পর্যায়ের সংশোধনী একান্তই ভদ্রজনোচিত, তাই সে ব্যাপারে নবী-রাসূল বুযুর্গ-মনীষীগণের মৌখিক অনুমতি রয়েছে এবং বাস্তবেও তা করে প্রমাণিত করেছেন। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ের সংশোধন পদ্ধতির অনুমতি থাকলেও সে সম্পর্কে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ لَمْ تَضْرِبْ خِيَارُكُمْ "আর তোমাদের যারা স্ত্রীকে মারবে না তারা উত্তম লোক। নবী রাসূলদের থেকে এ ধরনের কাজ সংঘটিত হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই।"

এ অবাধ্যতার ধরন ও মাত্রা সম্পর্কে স্বামীকে অবশ্যই সচেতনতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সাধারণ মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে এমনটি হওয়া অনভিপ্রেত ও অসংগত। পক্ষান্তরে, আল্লাহর নাফরমান কোনো স্বামী যদি স্ত্রীর দীনি কাজ-কর্ম ও শরীয়তী আমল সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে তার আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যকীয় নয়। বিশেষত কোনো ফরয কাজে বাধা দিলে তা অমান্য করাই হবে স্ত্রীর কর্তব্য। বস্তুত দাম্পত্য জীবনেও তেমনি সহনশীলতা দরকার, যেমন তা প্রয়োজন সামাজিক জীবনে। আয়াতের শেষাংশে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, যদি এ তিনটি পর্যায়ের যে কোনো অবস্থায় বা পর্যায়ে যদি তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের মানতে আরম্ভ করে দেয়, তবে তোমরা আর বাড়াবাড়ী করতে যাবে না, বরং অতীত পর্যালোচনা ছেড়ে দিয়ে তাদের সাথে স্বাভাবিক আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করবে। স্ত্রীরা নমনীয়তা প্রদর্শন করার পরেও কথায় কথায় তাদের দোষ-ক্রটির পথ খুঁজতে যাবে না, তাদের দোষ ধরে বেড়াবে না। জেনে রেখ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নারীদের উপর কোনো উচ্চ মর্যাদা দান করেননি, আল্লাহর মহত্ব ও ক্ষমতা তোমাদের উপরও বিরাজিত, তোমরা অযথা বাড়াবাড়ী করলে তার শাস্তি তোমাদেরকেও ভোগ করতে হবে।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সংশোধনী মনোভাবাপন্ন নারী-পুরুষ তথা স্বামী-স্ত্রীর সুন্দর সুষ্ঠু দাম্পত্য জীবনের এক চমৎকার ব্যবস্থা দিয়েছেন। এতে করে পরিবারের বিষয়টি ঘরের মধ্যে পরস্পরের সমঝোতায় একটা অনুকূল ও সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে। স্বামী-স্ত্রী—দু'জনের বিবাদ-বিসংবাদ, ভুল বুঝাবুঝি তাদের দু'জনের মধ্যেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। তৃতীয় কোনো লোকের মধ্যস্থতার আবশ্যক হয় না। নিজেদের কথা বাইরের কেউ জানতেও পারে না। ফলে উভয়ের পারস্পরিক গোপনীয়তা, মানসম্ভ্রম ও সামাজিক মর্যাদাও অক্ষুণ্ন থাকে।

বায়ান্ন

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ○

"আর যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতির আশংকা কর তবে স্বামীর আত্মীয়-স্বজন থেকে একজন আর স্ত্রীর আত্মীয় স্বজন থেকে একজন সালিস নিযুক্ত কর। তারা দু'জনই সংশোধন ও মিটমাট চাইলে আল্লাহ তাদের তাওফীক দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৫)

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কচ্ছেদের আশংকায় সালিসের মাধ্যমে মীমাংসার নির্দেশ

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার মনোমালিন্য পরস্পরের মধ্যেই মীমাংসা হয়ে যাওয়া উভয়ের জন্য মঙ্গলজনক। কিন্তু আল্লাহ না করুন যদি অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, এখন আর দু'জনের মধ্যে ঘরোয়াভাবে মীমাংসিত হওয়ার মত অবস্থায় থাকলো না বরং তা ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তখনো বিষয়টি অন্ততঃ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সীমিত রেখে তাদের মাধ্যমেই বিবাদ মীমাংসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন, মুসলমানদের জামায়াত ও সরকারী প্রশাসনকে সম্বোধন করে এমন এক পূত-পবিত্র পন্থা বলে দেয়া হয়েছে যাতে করে উভয় পক্ষের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যেতে পারে এবং সেই সাথে পরস্পরের অপবাদ আরোপের পথ বন্ধ হয়ে আপোষ মীমাংসার পথ বেরিয়ে আসতে পারে। তাছাড়া ঘরের বিবাদ ঘরে মীমাংসা হতে না পারলেও তা যেন পরিবারের মধ্যেই সমাধা হয়ে যায়—আদালতে মামলা রুজু করার ফলে বিষয়টি যেন হাট-বাজারে বিস্তার লাভ করতে না পারে। সমাজে যেন ঘটনাটি ছড়িয়ে না পড়ে।

আর তার পদ্ধতি হলো, সরকার উভয় পক্ষের মুরব্বী-অভিভাবক অথবা মুসলমানদের কোনো শক্তিশালী জামায়াত বা সংস্থা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপোষ করিয়ে দেয়ার বা ফায়সালায় পৌঁছে দেয়ার জন্য দু'জন সালিস ঠিক করে

দেবেন। একজন স্বামীর পরিবার থেকে, একজন স্ত্রীর পরিবার থেকে। এখানে সালিস অর্থে 'হাকাম' শব্দ প্রয়োগ করে কুরআন নির্বাচিত সালিসদ্বয়ের প্রয়োজনীয় গুণবৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করেছে। তাহলো সালিসদ্বয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার যোগ্যতা ও গুণ থাকতে হবে। আর এ গুণটি তো এমন ব্যক্তির মধ্যেই থাকতে পারে যিনি হবেন বিজ্ঞ এবং তৎ সংগে বিশ্বস্ত ও দিয়ানতদার।

আয়াতে উভয় পক্ষের সালিস নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তারা কি কি কাজ করবেন, তারা কোন্ পদ্ধতি প্রয়োগে মীমাংসায় পৌঁছবেন, আয়াতে সে কথা বলে দেয়া হয়নি। অবশ্য এ প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ

إِنْ يُرِيدَآ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ط

অর্থাৎ "তারা উভয়ে যদি সমস্যার সমাধান চায়, তাদের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতার মনোভাব থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজে সহায়তা করবেন আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করে দেবেন।"
–(মাআরেফুল কুরআন)

আয়াতে তারা উভয় মানে দু'জন সালিস অথবা স্বামী-স্ত্রী—দু'টোর একটা অথবা দু'টোই হতে পারে। প্রত্যেক বিবাদেরই একটা মীমাংসা হওয়া সম্ভব, কিন্তু শর্ত হলো উভয় পক্ষকে অবশ্যই সন্ধি প্রিয় হতে হবে, আর যারা সালিস করে বা মধ্যস্থ হয় তাদেরও আন্তরিকতা সহকারে যে কোনোভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দেয়ার মানসিকতা ও সর্বাত্মক চেষ্টা থাকতে হবে।

মীমাংসার পন্থা সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনে বলা হয়েছে এভাবে যে, স্বামী ও স্ত্রীর পরিবারের এক একজন লোক একত্রিত হবে এবং অনৈক্যের মূল কারণ অনুসন্ধান করে সম্মিলিতভাবে চিন্তা করে উভয়ের মধ্যে মিল সৃষ্টির পথ খুঁজে বের করবে। কিন্তু এ পঞ্চায়েত বা সালিস নিযুক্তির কাজ কে করবে—এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহ তা'আলা এখানে অস্পষ্টই রেখেছেন। তাই স্বামী-স্ত্রীই ইচ্ছা করলে নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকে এক একজন লোক নিজেদের অনৈক্য মীমাংসার জন্য নিযুক্ত করবে। তা না হলে উভয় পরিবারের মুরব্বীগণ হস্তক্ষেপ করে পঞ্চায়েত নিযুক্ত করবে। আর আদালত পর্যন্ত মোকদ্দমা দায়ের হলে আদালত নিজেই কোনো সিদ্ধান্ত করার পূর্বে পারিবারিক পর্যায়ে পঞ্চায়েত নিযুক্ত করে মীমাংসার চেষ্টা করবে।

সালিসের ক্ষমতা-ইখতিয়ার কতটুকু থাকবে—এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ফিক্হবিদের একদলের মত হলো, সালিসগণ চূড়ান্ত ফায়সালা করতে পারবে না, মীমাংসার যে পন্থা কার্যকরী হতে পারে বলে তারা মনে করবেন,

তারা কেবল তার সুপারিশ করতে পারবে মাত্র ; তা মেনে নেয়া বা না নেয়া দম্পতির মর্জির উপর নির্ভর করবে। কিন্তু দম্পতি যদি তালাক, খোলা অথবা অন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে ফায়সালা করার জন্য তাদেরকে নিজেদের উকিল নিযুক্ত করে, তবে তাদের ফায়সালা মেনে নেয়া দম্পতির উপর ওয়াজিব হবে। এটা হানাফি ও শাফেয়ী মাযহাবের আলেমদের মত। অন্য ফকীহদের মতে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার তাদের নেই। হাসান বসরী, কাতাদাহ প্রমুখ একথাই বলেছেন। ফকীহদের আরেক দলের মতে দম্পতির মধ্যে মিলন কিংবা বিচ্ছেদ ঘটানোর পূর্ণ ইখতিয়ার সালিসদের রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সাঈদ ইবনে যুবাইর, ইবরাহীম নখয়ী, শাবী, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন এবং অন্যান্য ফকীহগণ এ মত ব্যক্ত করেছেন।–(তাফহীমুল কুরআন)

হযরত ওসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) বিভিন্ন ফয়সালার যেসব নজীর আমাদের সম্মুখে রয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, তাঁরা দু'জনই সালিস নিযুক্ত করে আদালতের পক্ষ থেকে সালিসদের রাজকীয় ক্ষমতা দান করতেন। হযরত আকীল ইবনে আবু তালিব এবং তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে উতবা ইবনে রাবিয়ার মোকদ্দমা যখন হযরত ওসমান (রা)-এর আদালতে পেশ করা হলো, তখন তিনি স্বামীর পরিবার থেকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে, স্ত্রীর পরিবার থেকে হযরত মুআবিয়া (রা) ইবনে আবি সুফিয়ান (রা)-কে সালিস নিযুক্ত করলেন, আর তাদের বললেন ঃ আপনারা দু'জনই যদি এদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তবে তাই করে দেবেন। তাছাড়া হযরত আলী (রা)ও একটি মোকদ্দমায় সালিস নিযুক্ত করে তাকে বলেছিলেন ঃ হয় মিলন, না হয় বিচ্ছেদ—দু'টির একটি করে দিন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সালিস নিজে কোনো আদালতী ক্ষমতার মালিক নয়, তবে আদালত যদি সালিস নিযুক্ত করার সময় তাদের এখতিয়ার দেয় তবে তাদের ফায়সালা আদালতের ফায়সালার ন্যায়ই কার্যকর হবে।–(তাফহীমুল কুরআন)

হযরত আলী (রা)-এর সময়কার একটি ঘটনা সুনানে বায়হাকী গ্রন্থে হযরত ওবায়দা সালমানীর রেওয়ায়েত ক্রমে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হযরত আলী (রা)-এর খেদমতে হাজির হলো। তাদের উভয়ের সাথে ছিল বহু লোকের এক এক দল। হযরত আলী (রা)-এর নির্দেশে পুরুষের পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন হাকাম বা সালিস নির্ধারণ করা হলো। তাদের সম্বোধন করে হযরত আলী (রা) বললেন, তোমরা কি তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জান ? আর তোমাদের কি করতে হবে তা কি তোমরা অবগত ? শোন, তোমরা যদি এ স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে রাখার ব্যাপারেও তাদের পারস্পরিক আপোষ করে দেয়ার ব্যাপারে একমত হতে পার,

তবে তাই কর। পক্ষান্তরে তোমরা যদি মনে কর যে তাদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করা সম্ভব নয় ; কিংবা তা করে দিলে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে না এবং তোমরা উভয়েই একমত হয়ে তাদের পৃথক করে দেয়া ভাল মনে কর—এতেই মঙ্গল বিবেচনা কর, তবে তাই করবে। একথা শুনে মহিলাটি বললো, আমি একথা মেনে নিলাম। উভয় সালিস আল্লাহর আইন অনুসারে যে ফায়সালা করবে—তা আমার মতের পক্ষে হোক অথবা বিরোধী হোক, আমি তাই মেনে নেব। কিন্তু পুরুষটি বললো, পৃথক হয়ে যাওয়া বা তালাক হয়ে যাওয়া আমি কোনোক্রমেই সহ্য করবো না। অবশ্য সালিসদের এ অধিকার দিচ্ছি যে, তারা আমার উপর যে কোনো রকম আর্থিক জরিমানা আরোপ করে তাকে (স্ত্রীকে) সম্মত করিয়ে দিতে পারে।

হযরত আলী (রা) বললেন, তা হয় না। তোমারও সালিসদের তেমনি ক্ষমতা দেয়া উচিত। যেমন স্ত্রী দিয়েছে।

এ ঘটনা থেকে কোনো কোনো মুজতাহিদ ইমাম নিয়ম উদ্ভাবন করেছেন যে, সালিসদের এখতিয়ার সম্পন্ন হওয়া উচিত। যেমন হযরত আলী স্বামী স্ত্রীকে বলে সালিসদের ক্ষমতা সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু ইমাম আযম হযরত আবু হানিফা (রা) ও হযরত হাসান বসরী (র) সাব্যস্ত করেছেন যে, উল্লিখিত সালিসদের যদি ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়াই অপরিহার্য হতো, তবে হযরত আলী কর্তৃক উভয় পক্ষের (স্বামী-স্ত্রীর) সম্মতিলাভের চেষ্টা করার কোনো প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। সুতরাং উভয়ের সম্মতি আদায়ের চেষ্টাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃতপক্ষে এ সালিসদ্বয় ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী যদি অধিকার বা ক্ষমতা দেয়, তবে তারা ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে যাবে।

কুরআনুল কারীমের এ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের পারিবারিক বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে অতি চমৎকার এক নতুন পথের উন্মোচন হয়েছে। যে পথে মামলা মোকদ্দমা আদালতে যাবার পূর্বেই পারিবারিক কিংবা সামাজিক পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মীমাংসা করা যেতে পারে।—(মা'আরেফুল কুরআন)

তিপ্পান্ন

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ○ (النساء : ١٢٤)

"যে ব্যক্তি কোনো সৎকাজ করে সে পুরুষ হোক বা নারী হোক, সে ঈমানদার হয়ে থাকলে, এরূপ লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে ; তাদের প্রতি তিল পরিমাণও যুল্‌ম করা হবে না।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১২৪)

ঈমান ও আমলের পুরস্কার প্রাপ্তিতে নারী-পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই

যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ঈমান রাখে আর কুরআন নির্দেশিত পথে থেকে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করে, সে জান্নাত লাভ করবে। তার ঈমান ও আমলের প্রতিদান প্রদানে তিল পরিমাণও যুল্‌ম করা হবে না। চাই সে ব্যক্তি পুরুষ হোক অথবা হোক মহিলা। সে কুরআন ছাড়া অন্য কোনো আসমানী কিতাবের আহল হলেও। অর্থাৎ যে যাই থাকুক না কেন যদি সে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান রাখে আর ঈমান রাখে যাবতীয় বিশ্বাস্য বিষয়ের প্রতি এবং আমল করে তদানুযায়ী। তবে তো সে হলো মসুলিম, আর তার ঈমানের ও আমলের পুরস্কারও সে পাবে পুরোপুরি। পূর্বে অন্য কিতাবধারী বা ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে অথবা বর্তমানে নর বা নারী হওয়ার কারণে কারো ঈমান ও আমলের পুরস্কারে কোনো প্রকার তারতম্য করা হবে না। দুনিয়ার নিযাম বা শৃংখলা রক্ষার জন্য মানুষ নারী-পুরুষে বিভক্ত হলেও ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য করা হবে না।

মানুষ নারী ও পুরুষ হওয়ার কারণে দৈহিক-মানসিক শক্তিতেও তারতম্যের অধিকারী হয়েছে। প্রকৃতিগতভাবেই নর-নারীর এ পার্থক্য রয়েছে, আর সেভাবেই তাদের মধ্যে ইসলামী জীবন বিধানে দায়িত্ব বণ্টন ও কর্তব্য কাজের সীমারেখা সূচিত হয়েছে। মূলত এ তারতম্য তাদের কাউকেও অধিক সম্মানী আর কাউকেও স্বল্প সম্মানী হওয়ার ব্যাপারে পার্থক্য নিরূপণ করে না।

সূরা আল আহ্যাবের ৩৫ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ○ (الحزاب : ٣٥)

"নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিক্‌রকারী পুরুষ যিকরকারী নারী—এদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।"–(সূরা আল আহযাব ঃ ৩৫)

কুরআন শরীফের যাবতীয় আহকাম নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য হলেও বিভিন্ন আয়াতে মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষ বাচক শব্দ দিয়ে, আর নারীকে ধরা হয়েছে পুরুষ বাচক শব্দেরই মাধ্যমে। মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-এর মতে এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, নারীদের সকল বিষয় থাকবে গোপনীয়, আর এর মধ্যেই তাদের প্রকৃত মর্যাদা নিহিত রয়েছে। কুরআনুল কারীমে দেখা যায় যে, হযরত মারইয়াম ছাড়া অন্য কোনো মাহিলার নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। যেখানে কোনো নারী বিশেষের কথা এসেছে সেখানে সংশ্লিষ্ট পুরুষের সাথে সম্পর্ক সূচক শব্দে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন امرأة نوح ও امرأة فرعون ইত্যাদি। হযরত মারইয়াম (আ)-এর নাম উল্লেখের কারণও ছিল এই যে, হযরত ঈসা (আ)-এর পিতা না থাকায় মাতার নামের সাথে তাঁর সম্পর্ক স্থাপন করার কোনো বিকল্প ছিল না। বাকী আল্লাহই ভাল জানেন।

কুরআনুল কারীমের এ প্রকাশভংগী যদিও এক বিশেষ প্রজ্ঞা, যৌক্তিকতা ও মঙ্গলের ভিত্তিতেই অনুসৃত হয়েছিলো, তবুও আল্লাহর গোপন রহস্য মানুষের বোধগম্যের বাইরে বিধায় এ কারণে নারীগণের মধ্যে হীনমন্যতার উদ্রেক

হওয়া ছিল একান্ত স্বাভাবিক। তাই হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়াত মতে নারীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আরয করলো যে, আল্লাহ পাক কুরআনে মানুষকে সম্বোধন করতে গিয়ে কেবল পুরুষ বাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এতে বুঝা যায় আমাদের (নারীদের) মধ্যে কোনো কল্যাণ বা পুন্য নেই—আর সে জন্য আমাদের ইবাদাতও কবুল হয় না। ইমাম বাগবীর রেওয়ায়াত অনুযায়ী প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল পুন্যবতী নারীগণের পক্ষ থেকে। তিরমিযি শরীফে হযরত উম্মে আম্মারা থেকে, কোনো কোনো বর্ণনা মতে হযরত আসমা বিনতে উমায়েস থেকেও এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপনের কথা বর্ণিত আছে। জবাবে সূরা আহযাবের ৩৫নং আয়াত নাযিল হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যেসব ঈমানদার লোক ভাল কাজ করবে তাদের জন্য আল্লাহ পাক ক্ষমা ও মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। পুরুষ বা নারী হওয়ার কারণে কোনো মানুষের ঈমান ও আমলের ফলাফলের মধ্যে কোনো প্রকার তারতম্য বা বেশকম করা হবে না। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।–(মা'আরেফুল কুরআন)

দুনিয়াতে মীরাস বন্টনে কিছুটা পার্থক্য থাকার দায়িত্ব ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রের ব্যাপারে তারতম্য থাকা ইত্যাদি সর্বজ্ঞ ও মহাকৌশলী রাব্বুল আলামীনের সেই হেকমতেরই অন্তর্ভুক্ত—যে কারণে তিনি নারী-পুরুষকে গঠন প্রকৃতিতেও পার্থক্য করেছেন। নারীগণ দৈহিক গঠনে যেমন পুরুষের চেয়ে ভিন্ন রকমের, তেমনি তারা মন-মানসিকতার ব্যাপারেও স্বতন্ত্র ধরনের। নারী হওয়ার কারণে পুরুষদের থেকে তাদের যে দৈহিক পার্থক্য রয়েছে, তাছাড়াও প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও রয়েছে বিরাট পার্থক্য। শরীরতত্ত্ববিদদের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের যেসব অংগ-প্রত্যঙ্গ বাহ্যত একই রকম মনে হয় ; প্রকৃতপক্ষে সেসব অংগ-প্রত্যঙ্গেও নারীরা পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বস্তুত এসব কিছু দুনিয়ার নিযাম ও শৃংখলা বিধানের জন্যই এভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই বলে সে কারণে নর ও নারীর ঈমান-আমল তথা বিশ্বাস ও কর্ম ফলের ব্যাপারে কোনোই পার্থক্য করা হবে না। নর বা নারী হওয়ার কারণে কারো কর্মফলে তিল পরিমাণও পার্থক্য করা হবে না।

ছুয়ান্ন

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ لا وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِيْ الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِيْ لاَتُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ لا وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ○(النساء : ١٢٧)

"লোকেরা তোমাকে বিধান জিজ্ঞেস করছে। বল, আল্লাহ তাদের ইয়াতীম মহিলাদের বিষয়ে বিধান দিচ্ছেন। আর কুরআনে তোমাদের যা যা তিলাওয়াত করে শুনানো হয় ঐসব পিতৃহীনা নারীদের বিধান যাদেরকে তোমরা নির্ধারিত অধিকার দাও না অথচ তাদের বিবাহ করতে আগ্রহ রাখ, আর অক্ষম শিশুদের বিধান। আল্লাহ আরও বিধান দিচ্ছেন যে, তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করবে।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ১২৭)

ইয়াতীম মেয়ে ও ইয়াতীম শিশুদের হক সংরক্ষণে তাকীদ

এ সূরার শুরুতে ইয়াতীম ও নারীদের অধিকার ও হক সম্পর্কে বিশেষ বিধান দিয়ে তা আদায় করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ, জাহেলী যুগে অনেকে তাদের মীরাস দিতো না, কেউ তাদের মীরাস সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ও সম্পত্তি বেমালুম হজম করে ফেলতো, আর কেউ কেউ তাদের বিয়ে করে পূর্ণ মোহরানা দিতো না। কুরআনে ইতিপূর্বে এহেন গর্হিত কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু কতিপয় লোক মনে করতে লাগলো যে, উপরোক্ত নির্দেশ হয়ত কিছুসংখ্যক লোককে সাময়িকভাবে দেয়া হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত ঐ বিধান রহিত হয়ে যাবে। অনেকে ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কিত উক্ত বিধান রহিত হওয়ার অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে। অবশেষে যখন তা রহিত হলো না, তখন তারা পরামর্শ করে স্থির করলো যে, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হবে। সে মতে তারা রাসূলের কাছে গিয়ে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলো। তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে উল্লেখ করা

হয়েছে যে, ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযিরের বর্ণনা অনুযায়ী এ প্রশ্নই হচ্ছে আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ যেসব ইয়াতীম বালিকা সম্পদের মালিক হলেও সুন্দরী ছিলো না, তাদের (গায়র মুহরম) অভিভাবক তাদের রূপহীনতার কারণে তাদের বিবাহ্ করতে চাইতো না। অথচ তার সম্পদের লোভে অন্যের কাছেও বিবাহ্ দিতো না। এভাবে তারা অসহায় বালিকার বিবাহ ঠেকিয়ে রাখতো। এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আলী ইবনে আবি তালহা এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, জাহেলী যুগে কারো অভিভাবকত্বে ইয়াতীম বালিকা থাকলে সে তার গায়ে নিজের কাপড় রেখে দিতো। এরূপ করার কারণে সেই বালিকাকে আর কেউ কখনো বিবাহ্ করতে পারতো না। বালিকাটি রূপসী হলে সে নিজেই তাকে বিবাহ্ করতো, আর এভাবেই তার সম্পদ আত্মসাত করে নিতো। আর বালিকাটি রূপসী না হলে সে নিজে তো তাকে বিবাহ্ করতো না, অন্যকেও বিবাহ্ করার সুযোগ দিতো না। এভাবে সে তার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করতো। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি এরূপ অত্যাচার করতে তাদের নিষেধ করেছেন।

জাহেলী যুগে এভাবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও কন্যা সন্তানকে তাদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো। উপরিউক্ত আয়াতে তাদের প্রতি যুল্ম থেকে বিরত থাকার জন্যও বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহারের যে নির্দেশ দিয়েছেন, তার তাৎপর্য হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রা) এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, ইয়াতীম বালিকা রূপসী ও ধনবতী হলে তোমরা যেমন তাদের বিবাহ্ করতে আগ্রহী হও, তারা রূপহীনা আর নির্ধন হলেও ঠিক তেমনি তাদের বিবাহ্ করবে।–(ইবনে কাসীর)

পৃথিবীতে অনেক সময় মানুষ মারা যায়, আর তাদের ছেলে-মেয়েরা হয়ে পড়ে অভিভাবকহীন অসহায়। দুনিয়ার মানুষ ধন-সম্পদের প্রতি এতই লোভী হয়ে আছে যে, তারা যদি এরূপ পিতা-মাতা হারা কোনো ইয়াতীম সন্তানের অভিভাবক হয়ে থাকে, তবে এসব ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতে মেতে উঠে।

তারা একটুও চিন্তা করে না যে, তার সন্তানদেরও এমনি অবস্থা হতে পারে। পরের সন্তানের অসহায়তার প্রতি তারা দয়াদ্র না হয়ে বরং সুযোগ সন্ধানী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠে। ঈমানদারগণ কখনো এমন পাষণ্ড হতে পারে না। সকল আশ্রয়হীনের আশ্রয় হলেন আল্লাহ্ তা'আলা ; সকল অসহায়ের সহায় হলেন আল্লাহ তা'আলা। কাজেই যে ব্যক্তি ইয়াতীম—অসহায়কে আশ্রয় দিল সে যেন আল্লাহর পক্ষে দায়িত্ব পালন করলো, যেন আল্লাহর কাজে সহযোগিতা করলো।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এরূপ ভাল কাজ করতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করছেন। তোমাদের সমস্ত ভাল কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ অবহিত আছেন। তিনি তোমাদের সমস্ত সৎকাজের পুরো পুরস্কার দিয়ে দেবেন।-(ইবনে কাসীর)

কাজেই নিজের শ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয় করে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় ত্যাগ স্বীকার করা একজন আন্তরিকতা সম্পন্ন ঈমানদারের কাজ। স্বার্থপর লোকেরাই উপস্থিত লাভের সন্ধানে থাকে। আল্লাহতে অগাধ বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তি বৈষয়িক লাভ ক্ষতির দিকে না তাকিয়ে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে থাকেন। আল্লাহর পথে ব্যয় করতে, ইয়াতীম ও অসহায়কে অকাতরে দান করতে যদি কোনো মানুষ নাও জানে, তবুও মহান আল্লাহ তো সবকিছু দেখেন ও জানেন। সুতরাং ভাল কাজের সুফল তিনি অবশ্যই দেবেন।

পঞ্চান্ন

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ط وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا○(النساء : ١٢٨)

"কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামী থেকে দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে, তবে তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোনো দোষ নেই ; আপোষ নিষ্পত্তিই উত্তম। মানুষ লোভের কারণে স্বভাবতই কৃপণ। আর তোমরা যদি ইহসানকারী ও মুত্তাকী হও, তবে তোমরা যা করো আল্লাহ তার খবর রাখেন।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১২৮)

বিচ্ছিন্নতার চেয়ে আপোষ-মীমাংসা উত্তম

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বামী তার স্ত্রী থেকে বীতস্পৃহ ও পরাঙ্মুখ হওয়ার অবস্থায় তাদের পালনীয় বিধান বলে দিয়েছেন। কোনো স্ত্রীর ব্যাপারে তার স্বামী বিরাগভাজন বা উপেক্ষার ভাব দেখে যদি স্ত্রী তার প্রাপ্য বা দাবীর আংশিক ছেড়ে দিয়েও ঐ স্বামীর সাথে থাকতে চায় আর স্বামী এ সুযোগ গ্রহণ করে স্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হয় ; তবে এ ধরনের আপোষ মীমাংসার বিষয়ে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। আয়াতে এ জাতীয় আপোষ-মীমাংসায় শরীয়তের কোনো বাধা নেই। বাহ্যিকভাবে এটা ঘুষের মত মনে হলেও এটা আসলে কোনো গুনাহর কাজ নয়। ঘুষের মত মনে হওয়ার কারণ, এতে স্বামীকে মোহরানা বা অন্যান্য পাওনা থেকে অব্যাহতির প্রলোভন দেখিয়ে দাম্পত্য বন্ধন অটুট রাখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এতে উভয়ই কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে সমঝোতা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করে মাত্র। সুতরাং এটা সম্পূর্ণ জায়েয।–[মা'আরেফুল কুরআন–মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)]

ইমাম বুখারী (র) বলেন, হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এমনো দেখা যায়, কোনো স্ত্রী বৃদ্ধা হয়ে যাওয়ার কারণে স্বামী তার প্রতি বিরাগ হয়ে তাকে তালাক প্রদান করতে চায়, এতে স্ত্রী স্বামীর কাছে নিজের পাওনা হকের দাবী ত্যাগ করেও তাকে স্বামী হিসাবে বহাল রাখতে চায়। এ ব্যাপারেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।–(ইবনে কাসীর)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, সিমাক ইবনে হারব, সুলাইমান ইবনে মুআয ও আবু দাউদ আত তায়ালেসী বর্ণনা করেন, হযরত সাওদা (রা) আশংকা করেছিলেন যে, নবী করীম (স) তাঁকে তালাক দিতে পারেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাকে তালাক দিবেন না। আমার সাথে আপনার রাত যাপন বিষয়ক হক আমি আয়েশা (রা)-কে দিচ্ছি। নবী করীম (সা) তাই করলেন। তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।–(ইবনে কাসীর)

একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে হযরত আলী (রা) বললেন, কেউ তাঁর স্ত্রীর রূপহীনতা, বার্ধক্য, কর্কশ স্বভাব অথবা অপরিপচ্ছন্নতার কারণে তার প্রতি বীতরাগ ও বীতস্পৃহ হয়ে তাকে তালাক দিতে চাইলে এবং স্ত্রীর কাছে তালাক অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত হলে স্ত্রী যদি মোহরানার অংশবিশেষের দাবী অথবা স্বামীর কাছে তার রাত্রী যাপনের অংশ বিশেষের দাবী ত্যাগ করে, তবে তা জায়েয ও বৈধ। স্বামীর উক্ত সুবিধা গ্রহণ করায় কোনো দোষ নেই।
–(ইবনে কাসীর)

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ –"আপোষ নিষ্পত্তিই উত্তম।" আয়াতাংশের স্বাভাবিক তাৎপর্য এই যে, স্ত্রীকেই স্বীয় অধিকারের অংশবিশেষ ত্যাগ করা এবং স্বামী কর্তৃক এর বিনিময়ে স্ত্রীকে তালাক প্রদান থেকে বিরত থাকা তাদের বিচ্ছেদ অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়। হযরত সাওদা বিনতে যামআ (রা) কর্তৃক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রাপ্য রাত্রিবাসের অধিকার হযরত আয়েশা (রা)-কে দেয়ার বিনিময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাকে তালাক প্রদান থেকে বিরত থাকার ঘটনা উক্ত আয়াতে বর্ণিত সন্ধির একটি দৃষ্টান্ত। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতের জন্য এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যান। প্রকৃত কথা এই যে, 'তালাক' আল্লাহর কাছে অনভিপ্রেত বিষয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হালাল কাজসমূহের মধ্যে আল্লাহর কাছে অধিকতর অনভিপ্রেত কাজ হচ্ছে তালাক।

وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا -

"আর তোমরা যদি ইহসানকারী ও মুত্তাকী হও, তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।"–অর্থাৎ তোমাদের অপসন্দনীয় ও অনভিপ্রেত স্ত্রীদের ত্রুটি ও অযোগ্যতা তোমরা সহ্য করে তাদের সাথে বৈষম্যহীন আচরণ

করলে আল্লাহ তোমাদের সে আচরণ ও কাজ সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকেন, আর তিনি সে জন্য তোমাদের পূর্ণ পুরস্কার প্রদান করবেন।"–(ইবনে কাসীর)

وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ-

আয়াতাংশের আরেক তরজমা হলো, "নফস স্বভাবতঃ সংকীর্ণতার দিকেই ঝুঁকে পড়ে।" এ অর্থে স্বামী-স্ত্রীর সংকীর্ণতার তাৎপর্য হলো স্ত্রীলোক যদি নিজের মধ্যে স্বামীর চোখে অবাঞ্ছিতা হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলে মনে করে, আর তা সত্ত্বেও সে যদি বাঞ্ছিতা স্ত্রীর মত ব্যবহার পাওয়ার প্রত্যাশা করে, তবে এটাই হবে তার সংকীর্ণতা। পক্ষান্তরে যে স্ত্রীলোকটির স্থান স্বামীর মন থেকে মুছে যাওয়ার পরও সে ঐ স্বামীর সাথেই অবস্থান করতে চায়, আর স্বামী যদি এ স্ত্রীকে অত্যধিক কোণঠাসা করতে চায় এবং তার অধিকার চরম-ভাবে হরণ করতে চায়, তবে এটা হবে স্বামীর দিক থেকে সংকীর্ণতা।

–(তাফহীমুল কুরআন)

জাহেলী যুগে এক এক ব্যক্তি সীমা সংখ্যাহীন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো, এ ব্যাপারে তার ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। অথচ সেই অসংখ্য স্ত্রীদের ছিলো না কোনো নির্দিষ্ট অধিকার। সূরা আন-নিসার প্রাথমিক আয়াতসমূহে এ স্বাধীনতার উপর দু' ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হলো। এক ঃ স্ত্রীদের সংখ্যা চার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে গেল—এর অধিক এক সাথে বিবাহ করা হারাম ঘোষিত হলো। দুই ঃ এ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারেও 'আদল' বা সর্বক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার শর্ত আরোপ করা হলো। এমতাবস্থায় প্রশ্ন উত্থাপিত হলো, কারো স্ত্রী যদি বন্ধা বা চির রুগ্না হয় অথবা স্বামীর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার যোগ্য না হয়, আর স্বামী যদি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে বাধ্য হয়, তখন উভয় স্ত্রীর প্রতি সমান আকর্ষণ রাখা, সমান ভালবাসা পোষণ করা, দৈহিক সম্পর্কের ব্যাপারেও পূর্ণ সমতা রাখা কি তার জন্য অবশ্য কর্তব্য হবে ? আর সে যদি তা না করে তবে দ্বিতীয় বিবাহ করার পূর্বে প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দেয়াই কি উপরোক্ত শর্তের দাবী ? অধিকন্তু প্রথম স্ত্রী যদি বিচ্ছিন্ন হতে না চায়, তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন কোনো সমঝোতা হতে পারে কি, যাতে করে অবাঞ্ছিতা স্ত্রী নিজের কোনো অধিকার ও দাবী ত্যাগ করে স্বামীকে তালাক দেয়া থেকে বিরত রাখবে ? বস্তুত আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব প্রশ্নেরই উত্তর দেয়া হয়েছে।

এসব আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর নির্দেশাবলীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের মধ্যে উদারতার ভাবধারা জাগ্রত করতে চান। আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে তার স্ত্রীর প্রতি কোনো আকর্ষণ না থাকলেও স্ত্রীলোকটির সাথে ভাল ব্যবহার ও সদাচরণের আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ স্ত্রীলোকটি তো তার সাথে

দীর্ঘ সময় জীবন কাটিয়েছে। বহু বছর পর্যন্ত সে পুরুষটির জীবন সংগিনী হয়ে রয়েছে। সাথে সাথে সেই আল্লাহকে ভয় করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন, যিনি কোনো মানুষের দোষ-ত্রুটির কারণে নিজের অনুগ্রহের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে এবং তার ভাগ্যের অংশ হ্রাস করে দিলে এ দুনিয়ায় তার আশ্রয় গ্রহণের দ্বিতীয় কোনো স্থানই অবশিষ্ট থাকে না।-(তাফহীমুল কুরআন)

وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ-

আয়াতাংশের অপর একটি তরজমা হলো, "প্রত্যেক অন্তরেই লোভ বিদ্যমান রয়েছে।" এর তাৎপর্য হলো, স্ত্রী হয়তো মনে করবে যে, আমাকে বিদায় করে দিলে সন্তানাদির জীবন বরবাদ হবে, অথবা অন্যত্র আমার জীবন হয়তো আরো দুর্বিসহ হয়ে পড়বে। তার চেয়ে বরং এখানে কিছু ত্যাগ স্বীকার করে পড়ে থাকাই ভাল। পক্ষান্তরে স্বামী হয়তো মনে করবে যে দায়-দায়িত্ব হতে যখন অনেকটা রেহাই পাওয়া গেল, তখন তাকে বিবাহ বন্ধনে রাখতে ক্ষতি কি ? অতএব এভাবে অনায়াসে সমঝোতা হতে পারে।

-(মা'আরেফুল কুরআন)

ছাপান্ন

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ (النساء : ١٢٩)

"আর তোমরা যতই ইচ্ছা করো না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার কখনোই করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং তোমরা একজনের দিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না, আর অন্যকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখো না। তোমরা যদি নিজেদের সংশোধন করো আর সাবধান হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১২৯)

এক স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে গিয়ে অন্য স্ত্রীকে ঝুলন্ত রেখো না

আলোচ্য আয়াতে একাধিক স্ত্রীর সাথে বৈষম্যহীন আচরণ সম্পর্কিত একটি বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতির কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, তোমরা কখনো স্ত্রীদের সাথে বৈষম্যহীন আচরণ বজায় রাখতে সক্ষম হবে না। যদিও স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ করতে তোমরা আন্তরিকও হও। কারণ, স্ত্রীদের সাথে রাতযাপনে বা দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে বাহ্যিক সাম্য বজায় রাখা সম্ভব হলেও অন্তরের আকর্ষণ, ভালবাসা ও যৌন মিলনে বৈষম্য ও তারতম্য অবশ্যই থেকে যাবে। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা), উবায়দা আসলামী, মুজাহিদ ও হাসান বসরী প্রমুখেরও ব্যাখ্যা।

হযরত ইবনে আবু সুলায়কা বলেন, আয়াতটি হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রা)-কে অন্য যে কোনো স্ত্রীর চেয়ে বেশী ভালবাসতেন। হযরত আয়েশা (রা) থেকে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ, আবু কুলাবা, আইউব ও হাম্মাদ ইবনে সালমা প্রমুখ রাবীর সূত্রে ইমাম আহমদ এবং সুনান সংকলকগণ বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) নিজ স্ত্রীদের বৈষম্যহীন নীতি অনুসরণ করে চলতেন আর বলতেন, "আয় আল্লাহ যে বিষয়ে আমার ক্ষমতা রয়েছে সে বিষয়ে আমি এরূপ বণ্টন করলাম। যে বিষয়ে কেবল তোমরাই ক্ষমতা রয়েছে আমার ক্ষমতা নাই, সে বিষয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করো না। তিনি ক্ষমতা বর্হিভূত বিষয় বলতে মনের আকর্ষণকে বুঝিয়েছেন।–(ইবনে কাসীর)

এ আয়াতে فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ অর্থ স্ত্রীলোকটির অবস্থা এমন যে, স্বামী থেকেও না থাকার মত অথচ সে তালাক প্রাপ্তাও নয়। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে লোকের দু'টো স্ত্রী রয়েছে সে যদি এক স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণ রূপে ঝুঁকে পড়ে থাকে, তবে কিয়ামতের দিন তার শরীরের এক অংশ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় উপস্থিত হবে।-(ইবনে কাসীর)

আলোচ্য আয়াতের ভাবার্থ হলো, মানুষ দুই বা ততোধিক স্ত্রীর মধ্যে পূর্ণ সমতা রাখতে পারে না। কারণ একজন সুন্দরী অপরজন কুশ্রী, একজন যুবতী অন্যজন বয়স্কা, একজন রুগ্ন আরেকজন সাস্থ্যবতী, একজন কঠোর স্বভাবের, অন্যজন মধুর মেজাযের—স্ত্রীদের মধ্যে এরূপ আরো অনেক পার্থক্য থাকতে পারে। যে কারণে একজনের প্রতি স্বভাবতই অধিক আকর্ষণ ও অন্যজনের প্রতি কম আকর্ষণ হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এমতাবস্থায় প্রেম, ভালবাসা, মনের আকর্ষণ ও দৈহিক সম্পর্কের দিক থেকে উভয়ের সাথে সমতা রক্ষা করে চলতে হবে—আইন এমনটি দাবী করেনি। বরং আইনের দাবী হলো আকর্ষণের তারতম্য থাকা সত্ত্বেও যখন তুমি একটা স্ত্রীকে তালাক দাওনি এবং তাকে তোমার নিজের ইচ্ছায় অথবা তার বাসনায় এখনো স্ত্রী হিসেবেই রেখেছ। তখন তার সাথে এতটুকু সম্পর্ক অবশ্যই রাখতে হবে যাতে করে সে স্বামীহীনার মত হয়ে না পড়ে। উপরিউক্ত অবস্থায় একজন অপেক্ষা আরেকজনের প্রতি অধিক আকর্ষণ বা কম আকর্ষণ থাকা একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তাই বলে তাকে এমনভাবে ফেলে রাখা যাবে না যাতে করে মনে হতে পারে যে তার কোনো স্বামী নেই।-(তাফহীমুল কুরআন)

এ আয়াত থেকে কোনো কোনো লোক সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করেছে যে, কুরআন একদিকে সমতা রক্ষার শর্ত সাপেক্ষে বহু বিবাহের অনুমতি দিয়েছে, আর অপরদিকে সমতা রক্ষা অসম্ভব বলে সেই অনুমতিকে কার্যত বাতিল করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এরূপ সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো অবকাশই এ আয়াতে নেই। কারণ, কুরআন যদি "তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না" বলেই কথা শেষ করে দিতো, তাহলে এরূপ একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার যুক্তি দেখানো যেত। কিন্তু কুরআনে একটু পরেই বলা হয়েছে "একজন স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অন্যজনের দিকে একেবারেই ঝুঁকে পড়বে না।" একথা বলে উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো অবকাশ রাখেনি। আসলে খ্রীষ্টান ইউরোপের অনুসরণ করতে গিয়েই লোকেরা এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে আগ্রহী হয়ে উঠে।-(তাফহীমুল কুরআন)

আয়াতের শেষাংশের বক্তব্যও অনিচ্ছাকৃত মনের আকর্ষণকে দোষণীয় বলে প্রকাশ করা হয়নি। বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

অর্থাৎ "তুমি যদি নিজে যুলম করা থেকে নিজেকে বিরত রাখ, আর ইনসাফ করার যথাসাধ্য চেষ্টা কর, তবে স্বাভাবিক দুর্বলতার কারণে অনিচ্ছাকৃত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে আল্লাহ্ নিশ্চয় তা মাফ করবেন।"

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

সাতান্ন

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ۝

- *"স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তার প্রাচুর্য দিয়ে তাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় প্রজ্ঞাময়।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৩০)*

বিচ্ছেদের বিকল্প না থাকলে আল্লাহই প্রত্যেকের সহায়

ইসলামী সমাজের জন্য বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। বিবাহের মাধ্যমে সমাজের একটি ভিত্তি অর্থাৎ পরিবার গড়ে উঠে। মূলত এ বিবাহ প্রথা একটি সমাজের অপরিহার্য আবশ্যকীয় ইউনিট। যে সমাজে এ ভিত্তি যত মযবুত হবে সে সমাজ তত সুন্দর ও সুশৃংখল হবে। তাই ইসলামী শরীয়ত বিবাহ ব্যবস্থাকে সর্বদিক থেকে সুদৃঢ় ও সুশৃংখলভাবে আনজাম দানের ও সংরক্ষণের বিভিন্ন বিধি বিধান দিয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদ ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। এজন্যে আল কুরআন স্বামী-স্ত্রীকে যেমন একদিকে ন্যায্য অধিকার লাভের আইনগত সুযোগ দিয়েছে ; অন্যদিকে ধৈর্য, সংযম ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি ও সংরক্ষণের প্রতি উৎসাহিত করেছে। আর বিবাহ বিচ্ছেদ থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকার জন্য শিক্ষা দিয়েছে। এমনকি সম্পর্কের অবনতি ঘটার আশংকা দেখা দিলে উভয় পক্ষকেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে হলেও সমঝোতায় আসতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এতদসত্ত্বেও যদি আল্লাহ না করুন—কোথাও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক রক্ষা করা সাধ্যের বাইরে চলে গেছে, তখন উভয়ের বৃহত্তর স্বার্থে উদ্ভূত অস্বস্তিকর অবস্থার অবসানে ও অসহনীয় দুর্ভোগপূর্ণ জীবনের শৃংখলমুক্ত হওয়ার জন্য অগত্যা বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক দেয়া জায়েয। এহেন চরম পরিস্থিতিতেই ইসলামে তালাকের ব্যবস্থা রয়েছে।

বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে স্বামীর চেয়ে স্ত্রী অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সে জন্যে স্ত্রী নিজ অধিকারের অংশবিশেষ পরিত্যাগ করে হলেও স্বামীর সাথে সন্ধি করতে পারে। কিন্তু সন্ধির যাবতীয় সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়ে গেলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুমতি আছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তার অসাধারণ ক্ষমতার বলে এদের পরস্পরকে উভয়ের অমুখাপেক্ষী করে দিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্ববিষয়ে কর্ম বিধায়ক। আল্লাহ স্ত্রীর জন্য তালাকদাতা স্বামীর চেয়ে শ্রেয়

স্বামীর ব্যবস্থা করে দিতে পারেন ; আবার স্বামীর জন্য পরিত্যক্ত স্ত্রীর চেয়ে ভাল স্ত্রী মিলিয়ে দিতে পারেন।

আলোচ্য আয়াতে স্বামীদের তুলনায় স্ত্রীদের প্রতিই অধিকতর সান্ত্বনার বাণী ঘোষিত হয়েছে। কারণ, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের ফলে স্বামীর তুলনায় স্ত্রীই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সাধারণত স্ত্রীরাই তো অসহায় অবলা বিধায় একটা সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার পর দ্বিতীয় কোনো সুবিধাজনক সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনায় তারা বিচলিত হয়ে পড়ে। বিশেষত আজকের সমাজে তাই পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য আয়াতে উভয়ের মধ্যে কেবল সবল পক্ষের সুবিধাজনক অবস্থানের কথা নাকচ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা উভয়ের পূর্বাবস্থার একটি সন্তোষজনক নতুন অবস্থার সূচনা করতে পারেন। আল্লাহ্ বিপুল, ব্যাপক ইহ্সান, রহ্মত ও কৃপার মালিক। তিনি সকল কাজে প্রজ্ঞাময়, কৌশলী ও সূক্ষ্মজ্ঞানী। আল্লাহ্ সর্বাবস্থায় মানুষের কল্যাণের ব্যবস্থা করেন।

আয়াতে আল্লাহ একটা সান্ত্বনার বাণী ব্যক্ত করে বলেছেন يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ "আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর উভয়কে তার প্রাচুর্য দিয়ে অভাবমুক্ত করে দেবেন।" যখন পরস্পর সন্ধি-সমঝোতার যাবতীয় পথ রুদ্ধ হয়ে যায়—শত আন্তরিকতা সত্ত্বেও কোনোভাবেই যদি বিচ্ছেদের বিকল্প না থাকে। তখন আল্লাহ্ তা'আলাই তার প্রাচুর্য থেকে উভয়কেই পরস্পর থেকে আরও ভাল অবস্থায় নিয়ে যেতে পারেন। উভয়কে উভয়ের অভাবমুক্ত করে অধিকতর উত্তম ব্যবস্থা করা আল্লাহর জন্য অতি সহজ। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝ (النساء : ١٥٦)

"(আর তারা অর্থাৎ ইয়াহুদীরা অভিশপ্ত হয়েছিল) কুফরী করার কারণে এবং মারইয়ামের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ দেয়ার কারণে।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ১৫৬)

নিরপরাধ মারইয়ামকে দোষী সাব্যস্ত করার পরিণতি

আল কুরআনের আলোচ্য আয়াত এর পূর্ববর্তী ও তৎপরবর্তী কয়েকটি আয়াতে ইয়াহুদী জাতির কতগুলো জঘন্যতম গুনাহর বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এসব গুনাহ তাদের উপর আল্লাহর গযব ডেকে এনেছিল আর তাদের আল্লাহর হেদায়াত ও সত্য পথ থেকে বিভ্রান্ত করেছিল ও বহুদূরে নিক্ষেপ করেছিল। উপরিউক্ত আয়াতাংশে ইয়াহুদীদের উপর আল্লাহর গযব আসার দু'টো কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। একটি তাদের নবী কর্তৃক আনীত আল্লাহর সত্যদীনকে অস্বীকার করা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে মারইয়ামের উপর জঘন্য তোহমত আরোপ করা।

হযরত মারইয়াম ছিলেন বনী ইসরাঈলের অতীব শরীফ, খ্যাতিমান ও প্রসিদ্ধ ধর্মীয় পরিবারের এক অবিবাহিতা কন্যা। আল্লাহর কুদরত প্রকাশে পুরুষের মিলন ছাড়াও যে আল্লাহ সন্তান দিতে পারেন, তারই একমাত্র নযীর হিসেবে হযরত ঈসা (আ) পিতা ছাড়া বিবি মারইয়ামের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের ব্যাপারটি ইয়াহুদী জাতির নিকট প্রকৃতপক্ষে মোটেই সন্দেহের বিষয় ছিলো না। যেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন সেদিনই আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ইয়াহুদী জাতিকে সাক্ষী রেখে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এতো এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিশু, এর জন্মই একটি মুযিজা, এর সাথে নৈতিক অপরাধের কোনো সম্পর্ক নেই। অবিবাহিতা কন্যা মারইয়াম যখন কোলে বাচ্চা নিয়ে আসল, তখন জাতির ছোট-বড় শত-সহস্র লোক এসে সে ঘরে ভিড় জমায়। তারা বাচ্চা সম্পর্কে মারইয়ামকে জিজ্ঞেস করলে সে এ সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেনি। সে চুপচাপ থেকে হাতের ইশারায় বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করতে বললো। উপস্থিত জনতা সবিস্ময়ে বললো দোলনায় শায়িত এ শিশুকে আমরা কি জিজ্ঞেস করতে পারি ? আল্লাহর কুদরতে সে শিশুই কথা বলে তাদের জবাব দিল। সদ্যজাত শিশুটি স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ ভাষায় বলে দিল ঃ

إِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا ـ

"আমি আল্লাহর বান্দাহ, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আর আমাকে নবী বানিয়েছেন।"-(সূরা মারইয়াম ঃ ৩০)

এভাবে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম সম্পর্কিত সকল প্রকার সন্দেহ-শোবাহর মূলোৎপাটন করে দিলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তাই হযরত ঈসা (আ)-এর যৌবন কাল পর্যন্ত কেউ না মারইয়ামের প্রতি ব্যভিচারের দোষ চাপিয়েছে, না ঈসা (আ)-কে অবৈধ সন্তান বলে কোনো খোঁচা দিয়েছে। কিন্তু যখন হযরত ঈসা ত্রিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর নবুয়াতের দায়িত্ব পালন শুরু করলেন, ইয়াহুদীদের যাবতীয় বদ কাজের জন্য তিরস্কার করতে লাগলেন, তাদের নৈতিক পতনের বিষয়ে সাবধান করতে লাগলেন ; আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে, আর প্রত্যেক ক্ষেত্রে শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে যাওয়ার আহ্বান জানালেন, তখন ইয়াহুদীরা এ নির্ভিক ও সততার আওয়ায স্তব্ধ করে দেয়ার সকল অসদুপায় অবলম্বন করতে লাগলো। বিগত ত্রিশ বছর পর্যন্ত তারা যা বলেনি এখন তাই বলতে শুরু করলো। তারা বলতে লাগলো (নাউযুবিল্লাহ) "মারইয়াম ব্যভিচারিণী ছিলেন, ঈসা অবৈধ সন্তান।"—অথচ তারা নিসন্দেহে জানতো এ মা ও সন্তান উভয়ই ওসব মলিনতা ও কদর্য থেকে পূত-পবিত্র। তাই তাদের এ দোষারোপ আসলে কোনো সন্দেহের কারণে ছিলো না, বরং তা ছিল একেবারেই মিথ্যা। তারা তো জেনে বুঝে সত্যের বিরোধিতার জন্যই এরূপ বলছিলো, এজন্যে আল্লাহ তা'আলা তাদের এ আচরণকে যুল্‌ম ও মিথ্যা না বলে তাকে 'কুফর' বলে অভিহিত করেছিলেন। কারণ, এতে করে তাদের উদ্দেশ্য ছিল দীনের পথে বাধা সৃষ্টি করা মাত্র।

ঊনষাট

وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۭ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○ (النساء : ١٧٦)

"আর তারা যদি ভাই-বোন উভয় থাকে তবে একজন পুরুষ পাবে দু'জন নারীর অংশের সমান। আল্লাহ তোমাদের জন্য বিষয়টি পরিষ্কার করে বর্ণনা করছেন, যেন তোমরা ভ্রষ্ট হয়ে না যাও। আর আল্লাহ তো সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৭৬)

মীরাসের মাল নারীদের দ্বিগুণ পাবে পুরুষরা

আলোচ্য আয়াতটি সূরা আন নিসার সর্বশেষ আয়াত। সূরা নিসায় মীরাস সম্পর্কিত আলোচনাই প্রধান্য পেয়েছে। সর্বশেষ আয়াতটিতে তাই মূল বক্তব্যকে অধিকতর স্মরণীয় করার জন্য মীরাসের একটি মৌলিক নির্দেশিকা বর্ণিত হয়েছে বলে তাফসীরকারগণ মন্তব্য করেছেন।

আয়াতটির প্রথম থেকে 'কালালা'-র মীরাস সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। 'কালালা' বলা হয় এমন মৃত ব্যক্তিকে যার সন্তানাদি ও মাতা-পিতা নেই, কিন্তু বোন অথবা ভাই-বোন উভয়ই রয়েছে। এক বোন থাকলে পাবে মোট সম্পত্তির অর্ধেক। বাকীটা পাবে আসাবারা। 'আসাবা' না থাকলে সবটুকু পাবে বোন। দুই বোন থাকলে পাবে তিন ভাগের দুই ভাগ। বাকীটা পূর্বের ন্যায়। আর যদি মৃত ব্যক্তির বোন ও ভাই থাকে তবে ভাইয়েরা পাবে বোনদের দ্বিগুণ।

কেবল ভাই-বোন উত্তরাধিকারী থাকলে তাদের মীরাসের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এমনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি। আর তা হচ্ছে, সাধারণত মীরাস বণ্টনের ব্যাপারে, বিশেষত নারীদের মীরাস দেয়ার ব্যাপারে যেন কেউ ভ্রষ্ট হয়ে না পড়ে, বিভ্রান্তিতে পড়ে না যায়। কারণ জাহেলিয়াতের যুগে মীরাসের ব্যাপারে বড়ই যুলম করা হতো। যেমনটি হচ্ছে আধুনিক যুগেও। জাহেলী যুগে নারীদের উপর নানাভাবে যুল্ম করা হতো, ইয়াতীমদের হক নষ্ট করা হতো, বিশেষত ইয়াতীম বালিকাদের হক এবং নারীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো।

রাব্বুল আলামীন আল কুরআনে সকলকে তাদের অধিকার দানের বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়েছেন। অবশেষে বিশ্ববাসীকে বিশেষত মু'মিনদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا "আল্লাহ তোমাদের জন্য পরিষ্কার করে বর্ণনা করেছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হয়ে যাও।"

মানুষ আল্লাহর বিধানের রহস্য অনুধাবন না করে অনেক সময় নিজ নিজ বদ্ধমূল ধারণার ভিত্তিতে আল্লাহর বিধান নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার দুঃসাহস দেখিয়ে থাকে। যেমন উপরিউক্ত আয়াতে "একজন পুরুষ পাবে দু'জন নারীর অংশের সমান"–কথার বাহ্যিক অর্থের পরে ভিত্তি করে তারা বলতে থাকে যে ইসলাম নারীদের ঠকিয়েছে, নারী-পুরুষের অধিকারে বৈষম্য রেখেছে। কিন্তু তারা তো আল্লাহর বিধানের সার্বিক দিকগুলোর প্রতি একটুও দৃষ্টি দিতে না পারার কারণেই হয়ত এমনটি বলে থাকে অথবা চিন্তার বক্রতার কারণে এভাবে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে সমাজে অশান্তির সৃষ্টি করে। প্রথমতঃ তাদের জানা উচিত যে, ইসলামই নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদ তা করেনি। দ্বিতীয়তঃ নারীদের বিবাহদান পর্যন্ত তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব থাকে পিতার উপর। বিবাহের পর স্বামীর উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত হয়। তৃতীয়তঃ বিবাহের সময় মোহরানার অর্থ পেয়ে গেলে স্ত্রী একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থের মালিকানা লাভ করতে পারে। এতে স্বামীর বিন্দুমাত্র অধিকার থাকে না। স্ত্রী এ অর্থ নিজের মর্জি মাফিক কোনো ব্যবসায়ে বা কোনো উৎপাদনমূলক কাজে বিনিয়োগ করতে পারে। চতুর্থতঃ স্ত্রীর যাবতীয় ভরণ-পোষণ এমনকি প্রসাধনী ব্যয়ও স্বামীকেই বহন করতে হয়। স্ত্রীর যদি কোনো ব্যবসা অথবা চাকুরীও থাকে, তবুও তার খোর-পোষের পুরো দায়িত্ব স্বামীর। পঞ্চমতঃ স্ত্রী তার ভাইয়ের সাথে যে এক অংশ পেয়েছিল, সে সম্পদ তো তার পুরোটাই অব্যয় অক্ষয় থেকে যায় ; কিন্তু তার ভাইকে তো নিজের স্ত্রীর দায়-দায়িত্বও বহন করতে হয়। সুতরাং এক ভাই দুই বোনের অংশের সমান মীরাস পাওয়াটা একেবারেই যুক্তিযুক্ত। বাকী আল্লাহর হুকুম-আহকামের রহস্য তিনিই ভাল জানেন। তাঁর সকল হুকুম আন্তরিকতা সহকারে মেনে নেয়া আমাদের কর্তব্য। ব্যষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনার পথ পরিহার করে সামষ্টিক দৃষ্টিতে পর্যালোচনায় নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারলে মানুষের চিন্তার বক্রতা কেটে যেতে পারে। আল্লাহ সবাইকে তাওফীক আতা করুন। আমীন।

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ز وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

"তোমাদের জন্যে হালাল করা হলো, মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী আর তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের সচ্চরিত্রা নারী; যখন তোমরা তাদের মোহর দাও তাদের স্ত্রী করার জন্যে; কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্যে নয়। আর যে কেউ ঈমানের নীতি অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করে তার সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং আখিরাতে সে মহাক্ষতির সম্মুখীন হবে।"

–(সূরা আল-মায়িদাহ্ ঃ ৫)

মু'মিনগণ কি কোন অমুসলিমকে বিয়ে করতে পারে ?

আয়াতে 'মুহ্সানাত' محصنت শব্দের দু'টো অর্থ হতে পারে। এক, স্বাধীন ও মুক্ত, যার বিপরীত শব্দ ক্রীতদাসী। দুই, সচ্চরিত্রা ও সতী-সাধ্বী। অধিক সংখ্যক সাহাবী ও তাবেঈ আলিমের মতে এখানে দ্বিতীয় অর্থই প্রযোজ্য। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, যারা সচ্চরিত্রা বা সতী-সাধ্বী নয় তাদের বিয়ে করা হারাম। বরং আয়াতের মর্মার্থ হলো মু'মিনদের উত্তম ও চরিত্রবানদের বিবাহ করার প্রতি উৎসাহিত করা। অর্থাৎ ব্যভিচারিণী বা পাপাচারিণী মহিলাদের বিবাহ্ করা কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিমের কাজ নয়।

(মা'আরেফুল কুরআন, তাফসীরে মাযহারী থেকে)

আয়াতে الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ "যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল" বলে 'আহ্লে কিতাব' বা কিতাবী সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যাদের উপর আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল। বর্তমানকালে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়কে আহলে কিতাব বলা যায় না। কারণ, আহলে কিতাব বলতে বুঝায় ঐসব সম্প্রদায়কে যারা কোনো আসামানী কিতাব পেয়েছে বা আসামানী কিতাবের অনুসারী বলে দাবী করে—আর তা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। তাওরাত ও ইনজীলই এমন কিতাব আজকের বিশ্বে যার অনুসরণের কিছু কিছু দাবীদার বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু কুরআন মজীদের আরেকটি আয়াতে

ঘোষণা করা হয়েছে وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ "কোনো মুশরিক নারীকে বিয়ে করবে না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে।" এ আয়াতের মর্মানুসারে বর্তমান বিশ্বের ইয়াহুদী খৃষ্টান মহিলাদের বিয়ে করাও নাজায়েয। কারণ, তারা ঈসা (আ)-কে সহ তিন খোদায় বিশ্বাসী এবং নানা প্রকার শিরকে লিপ্ত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা)-এরও এ মত।

–(মা'আরেফুল কুরআন, আহকামুল কুরআন)

সূরা মায়িদাহ্র উক্ত আয়াতে আহলে কিতাব মহিলাদের বিয়ে করা হালাল বুঝালেও এ ধরনের বিয়ের ফলে কোনো মু'মিনের নিজের, তার সন্তান-সন্ততির এবং সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বাস্তবে যে অবশ্যম্ভাবী ক্ষতি ও অনিষ্ট দেখা দেবে তার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেঈর মতে অমুসলিম আহলে কিতাব মহিলাকে বিয়ে করা মাকরূহ বা অনুচিত।

বর্ণিত আছে, হযরত হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) মাদায়েন পৌঁছে জনৈকা ইয়াহুদী স্ত্রীলোকের পানি গ্রহণ করেন। হযরত ওমর ফারূক (রা) সংবাদ পেয়ে তাঁকে পত্র লিখে বললেন, "স্ত্রীলোকটিকে তালাক দিয়ে দাও।" হযরত হোযায়ফা উত্তরে লিখলেন, "সেকি আমার জন্য হারাম?" হযরত ওমর (রা) উত্তরে লিখলেন, "আমি হারাম বলছি না, কিন্তু ইয়াহুদী মহিলারা সাধারণত সচ্চরিত্রা বা সতী-সাধ্বী নয়। তাই আমার আশংকা, এ পথে না জানি তোমাদের পরিবারেও অশ্লিলতা ও ব্যভিচারের অনুপ্রবেশ ঘটে।"

–(আহকামুল কুরআন–জাস্সাস)

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান 'কিতাবুল আছার' গ্রন্থে এ ঘটনাকে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর অভিমত বলে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, দ্বিতীয়বার হযরত ওমর (রা) হোযায়ফাকে পত্রে বলেন ঃ

اعزم عليك ان لاتضع كتابي حتى تخلي سبيلها فاني اخاف ان يقتريك المسلمون فيختاروا نساء اهل الذمة لجمالهن وكفى بذالك فتنة لنساء المسلمين-

অর্থাৎ "তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, পত্র পাঠান্তে তা রেখে দেয়ার পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দাও। আমার আশংকা, অন্য মুসলিমরাও না জানি তোমার পদাংক অনুসরণ করে বসে। ফলে তারা যিম্মী আহলে কিতাব মহিলাদের রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মুসলিম মহিলাদের পরিবর্তে তাদের বেশি পছন্দ করতে শুরু করে দেবে। মুসলিম মহিলাদের জন্য এ বড় বিপদ!"

–(কিতাবুল আছার ঃ ১৫৬ পৃঃ)

আল্লামা ইব্‌নে হুমাম 'ফতহুল কাদীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, শুধু হোযায়ফা নয়, তালহা এবং কা'ব ইবনে মালেকও এরূপ ঘটনার সম্মুখীন হন। তাঁরাও সূরা মায়েদাহ্‌র এ আয়াত দৃষ্টে আহলে কিতাব মহিলাদের বিয়ে করেছিলেন। খলীফা হযরত ওমর (রা) এ সংবাদ পেয়ে তাদের প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হন এবং তালাক দেয়ার নির্দেশ দেন।–(তাফসীরে মাযহারী থেকে মা'আরেফুল কুরআন)

মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ) 'মা'আরেফুল কুরআনে' বলেন, ফারূকে আযমের যুগ ছিল সর্বোত্তম যুগ। কোনো ইয়াহুদী বা খৃষ্টান মহিলা মুসলমানদের সহধর্মিনী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার সম্ভাবনা তখন ছিল না। তাদের মধ্যে ব্যভিচারের অভ্যাস মুসলমানদের পরিবার কলুষিত করতে পারে আর তাদের রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মুসলমানরা তাদের অগ্রাধিকার দিবে এবং মুসলিম মহিলারা বিপদের সম্মুখীন হবে—এটাই ছিল তখনকার যুগের একমাত্র আংশকা। এতটুকু অনিষ্টকে সামনে রেখেই ফারূকে আযমের দূরদৃষ্টি উপরিউক্ত সাহাবীদের তাদের 'আহলে কিতাব' স্ত্রীদের তালাক দিতে বাধ্য করেছিলেন। যদি আজকালের চিত্র তাঁদের সামনে থাকতো, তবে অনুমান করুন, একে প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাঁরা কত কঠোর কর্মপন্থাইনা অবলম্বন করতেন ? আজকাল যারা আদম শুমারীর খাতায় নিজেদেরকে ইয়াহুদী-খৃষ্টান নামে লিপিবদ্ধ করায় তাদের অনেকেই বিশ্বাসের দিক থেকে খৃষ্টবাদ ও ইয়াহুদীবাদকে অভিশাপ মনে করে। তারা যেমন তাওরাত-ইনজীলে বিশ্বাস করে না, তেমনি হযরত মূসা-ঈসাকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করে না। বরং বিশ্বাসের দিক থেকে তারা পুরোপুরি নাস্তিক। শুধু জাতিগত কিংবা প্রথাগতভাবে নিজেদেরকে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান বলে থাকে।

এমতাবস্থায় তাদের মহিলারা মুসলমানদের জন্য কিছুতেই হালাল নয়। যদি ধরে নেয়া যায় যে, তারা স্বীয় ধর্মের অনুসরণ করে, তবুও তাদের মুসলিম পরিবারে স্থান দেয়া গোটা পরিবারের জন্য দুনিয়া-আখিরাতের ধ্বংস ডেকে আনার শামিল। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের প্রেক্ষিতে আজকালকার তথাকথিত আহলে কিতাব মহিলাদের বিয়ে করা থেকে মুসলমানদের বিরত থাকা কর্তব্য।

একষট্টি

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٥ (المائدة : ٣٨)

"আর চোর ও চোরনীর হাত কেটে দাও। এটা তাদের কর্মের শাস্তি, আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড। আল্লাহ তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"–(সূরা আল-মায়িদাহ্ ঃ ৩৮)

অপরাধী পুরুষ বা মহিলা—তাদের শাস্তি সমান

উপরিউক্ত আয়াতটি চুরি কর্মের দণ্ডবিধি সম্পর্কিত। এখানে বলা হয়েছে চোর পুরুষ হোক আর নারী হোক তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআনী বিধি-বিধানে কোনো বিষয়ে হুকুম করা হলে পুরুষদের সম্বোধন করে নির্দেশ দেয়া হয় আর নারীরা পুরুষদের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য বিধি-বিধানে কুরআন-সুন্নাহর রীতি তাই। কিন্তু চুরি ও যিনার শাস্তির বেলায় পুরুষ ও নারীকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ, এই বিধানটি হচ্ছে হুদূদ বা দণ্ডবিধি সম্পর্কিত। আর কোনো প্রকার সন্দেহ দেখা দিলে হুদূদ রহিত হয়ে যায়। এজন্যে এখানে পুরুষদের অধীনস্থ করে নারীদের সম্বোধন করা হয়নি। বরং নারীর কথা পৃথক করে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

প্রসংগত লক্ষণীয় যে, চুরির শাস্তির ব্যাপারে কুরআনে اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ বলে প্রথমে পুরুষের এবং পরে নারীর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যিনার ব্যাপারে اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى বলে প্রথমে নারী ও পরে পুরুষের কথা বলা হয়েছে। তাফসীরবিদগণ এই আগ-পর করার অনেক কারণ বর্ণনা করেছেন। মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ) তাঁর তাফসীর মা'আরেফুল কুরআনে বলেন, চুরির অপরাধ মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের ক্ষেত্রে অধিক গুরুতর। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা জীবিকা উপার্জনের যে শক্তি পুরুষকে দিয়েছেন তা নারীর মধ্যে নেই। জীবিকার এতসব পথ খোলা থাকা সত্ত্বেও চুরির মত হীন অপরাধে লিপ্ত হওয়া পুরুষের অপরাধকে আরো গুরুতর করে দিয়েছে। যিনা বা ব্যভিচারের ক্ষেত্রে অবস্থা এই যে, আল্লাহ তা'আলা নারীদের স্বাভাবিক লজ্জা-শরম ছাড়াও তাদের জন্য

যিনা থেকে বেঁচে থাকার মত উপযুক্ত পরিবেশও দিয়েছেন। তারপরও যদি সে নির্লজ্জতায় মত্ত হয়ে যিনার মত বেহায়াপ্নী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তা হবে জঘন্য অপরাধ। তাই চুরির আয়াতে আগে পুরুষের কথা পরে নারীর কথা এবং যিনার আয়াতে আগে মহিলার কথা পরে পুরুষের কথা বলা হয়েছে।

আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহ) তাঁর তাফসীর, তাফসীরে মাযহারীতে বলেন, চুরি করার জন্য সাহসের প্রয়োজন হয়, আর সাহস সাধারণত পুরুষের মধ্যেই বেশি থাকে ; পক্ষান্তরে যিনা হয় শাহ্ওয়াত (কামনা) থেকে, আর শাহ্ওয়াত (কামনা) সাধারণতঃ নারীর মধ্যেই বেশি থাকে। আবার কেউ কেউ বলেন, যিনার কাজ নারীর অনিচ্ছায় সংঘটিত হওয়া কঠিন বিধায় একাজে নারীর ভূমিকাই অধিক থাকে, তাই নারীর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীতে আরও বলা হয়েছে, চুরির কাজ হাত দ্বারা হয়ে থাকে বিধায় চুরির কারণে হাত কাটার বিধান রয়েছে। কিন্তু যিনার কাজ পুরুষাঙ্গ দিয়ে হলেও যিনার শাস্তিতে পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়নি ; কারণ তাতে বংশবৃদ্ধি লোপ পাবে।

চোরের হাত কাটার বিষয়টি প্রসংগে কোন্ হাত কতটুকু কাটতে হবে-এ বিষয়ে তাফসীরবিদগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে প্রসংগক্রমে সংক্ষিপ্তাকারে তার বিবরণ তুলে ধরা হলো ঃ

তাফসীরে মাযহারীর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ "হাত বলা হয় আংগুলের অগ্রভাগ থেকে কাঁধ পর্যন্ত অংগকে। এজন্যে খারেজীদের মতে চোরের হাত কাঁধ থেকে কেটে ফেলতে হবে। কিন্তু মুসলিম সমাজের সর্বকালের কব্জি থেকে কাটার নিয়ম চলে আসছে। এর উপরই ইজমা সংগঠিত হয়েছে। চোরের ডান হাত কাটতে হবে। আয়াতে হাত বলতে ডান হাতকেই বুঝানো হয়েছে আর একথার উপরই 'ইজমা' হয়েছে। কারণ হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর কিরাতে ايديهما। (উভয়ের হস্তদ্বয় এর স্থলে ايمانهما। (উভয়ের ডান হাত) বলা হয়েছে। আর মুসলিম সমাজে এ কিরাতের উপরই আমল চলে আসছে।"

তাফহীমুল কুরআনে বলা হয়েছে, দু'টো হাতই কাটতে হবে না, কাটতে হবে একটি হাত মাত্র। ইসলামী মিল্লাত এ ব্যাপারে একমত যে প্রথম চুরির ক্ষেত্রে ডান হাত কাটতে হবে। নবী করীম (সা) বলেছেন, لا قطع على خائن – "খিয়ানতকারীর হাত কাটা হবে না।" কারণ, খিয়ানত করাটা চুরি নয়। অবশ্য খিয়ানতের শাস্তি অন্যভাবে দেয়া হবে।

কি পরিমাণ চুরির জন্য চোরের হাত কাটতে হবে সে বিষয়ে তাফহীমুল কুরআনের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

নবী করীম (স) হিদায়াত দিয়েছেন, একটি ঢালের মূল্য থেকে কম মূল্যের জিনিস চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। নবী করীম (স)-এর সময়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা মতে একটা ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমরের মতে পাঁচ দিরহাম। হযরত আয়েশা (রা)-এর মতে এক দিনারের (স্বর্ণ মুদ্রা) এক-চতুর্থাংশ।

এ কারণে কত মূল্যের জিনিস চুরি করলে হাত কাটা হবে তা নির্ধারণের ব্যাপারে ইসলামী ফিক্হবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। ইমাম আবূ হানিফা (রহ)-এর মতে এর পরিমাণ দশ দিরহাম। ইমাম মালেক (রহ), শাফেঈ (রহ) ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ)-এর মতে এক চতুর্থাংশ দীনার। সেকালের দিরহামে ৩ মাসা ১ $\frac{১}{৫}$ রতি রূপা থাকতো আর এক-চতুর্থাংশ দীনার তিন দিরহামের সমান ছিল।

অনেক জিনিস এমন আছে যা চুরি করার দরুন চোরের হাত কাটার দণ্ড দেয়া যাবে না। যেমন–নবী করীম (সা) বলেছেন لاقطع فى ثمرة ولا كثر – "ফল ও তরকারী চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।" لا قطع فى طعام "খাদ্যবস্তু চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।" হযরত আয়েশ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

لم يكن قطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشئ التافة

"সামান্য জিনিস চুরি করলে নবী করীম (সা)-এর যুগে হাত কাটা হতো না।"

হযরত আলী (রা) ও উসমান (রা)-এর ফায়সালা রয়েছে لاقطع فى الطير "পাখী চুরি করলে হাত কাটা যাবে না" কোনো সাহাবী এ ফায়সালার প্রতিবাদ করেননি। অর্থাৎ সাহাবীগণ এতে একমত ছিলেন। হযরত উমর (রা) ও হযরত আলী (রা) বায়তুলমাল (সরকারী কোষাগার) থেকে চুরি করলে চোরের হাত কাটেননি। এ ব্যাপারেও কোনো সাহাবী মতভেদ করেননি। ইমাম আবূ হানিফা (রহ)-এর মতে তরকারী, গোশত, রান্না করা খাবার, যে ফসল এখনো খোলানো হয়নি, খেলার সরঞ্জাম ইত্যাদি চুরি করলে চোরের

হাত কাটা যাবে না। বনে-জংগলে বিচরণশীল জন্তু ও বায়তুলমালের জিনিস চুরি করলেও হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। কিন্তু এর মানে এ নয় যে, এসব অপরাধের কোনো শাস্তি নেই। শাস্তি তো দিতেই হবে, কিন্তু হাত কাটার দণ্ড এসব ব্যাপারে প্রয়োগ করা যাবে না।

আলোচ্য আয়াতে চুরির শাস্তি বর্ণনা করার পর দু'টো বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে। এক, جَزَآءً بِمَا كَسَبَا "এই শাস্তি হচ্ছে তাদের (চোর বা চোরনীর) কৃতকর্মের ফল।" দুই, نَكَالاً مِّنَ اللهِ "আল্লাহর পক্ষ থেকে সাজা" হিসেবে (এ হাত কাটার বিধান) আরবী অভিধানে نكال শব্দে বুঝায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিকে। অর্থাৎ যা দেখে অন্যরাও শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং অপরাধ থেকে বিরত থাকতে পারে। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হাত কেটে ফেলার মত কঠোর শাস্তিটি এজন্যে, যেন এক চোরের হাত কাটলে অন্য সব চোরের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। ফলে সমাজ থেকে এ ধরনের হীন অপরাধ বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় বাক্যের দ্বিতীয় অংশ مِنَ اللهِ 'আল্লাহর পক্ষ থেকে' বলে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইশারা করা হয়েছে। আর তা এই যে, চুরির অপরাধের দু'টো দিক রয়েছে। এক, চোর অন্যের উপার্জিত মালামাল অন্যায়ভাবে নিয়ে যায়। এতে মালিক মানসিক ও বৈষয়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এটা মালিকের উপর বিরাট জুলুম। দুই, চোর চুরি করে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচারণ করে থাকে। কাজেই প্রথম দিক থেকে চোর মালিকের হক নষ্ট করলো। আর এটা হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক বিধায় মালিক ক্ষমা করে দিলে মাফ হয়ে যাবে। কিসাসের সব বিষয়ের এটাই বিধান। দ্বিতীয় দিক থেকে চোর চুরি করে আল্লাহর হক (হক্কুল্লাহ) নষ্ট করলো। তাই মালিক চোরকে ক্ষমা করে দিলেও আল্লাহর এই হক মাফ হবে না। কারণ এটা আল্লাহ মাফ করলেই তবে মাফ হতে পারে। শরীয়তের পরিভাষায় এ হচ্ছে 'হদ'।

—(বহুবচন 'হদূদ')

আয়াতে مِنَ اللهِ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) উল্লেখ করে এই দ্বিতীয় দিকটিকে নির্দেশ করে দেয়া হয়েছে এই শাস্তি হদ—এটা কিসাস নয়। কাজেই মালিক ক্ষমা করে দিলেও এ শাস্তি রহিত হবে না।

—(মা'আরেফুল কুরআন ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী)

এখানে سَرِقَةٌ বা চুরি শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শরীয়তে চুরির পারিভাষিক অর্থ বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। 'কামুস' গ্রন্থে বলা হয়েছে,

"অন্যের মাল তার অনুমতি ছাড়া হেফাজতের স্থান থেকে গোপনে নিয়ে যাওয়াকে 'চুরি বলে"। শরীয়তের পরিভাষায়ও এটাই চুরি। اَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ مِنْ حِرْزٍ مُخْفِيًا চুরি প্রমাণের জন্য এই সংজ্ঞাটি ভালভাবে জানা থাকা দরকার। এ সংজ্ঞার কয়েকটি লক্ষ্যণীয় দিক হল ঃ

১. মালটি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীন হতে হবে। তাতে চোরের মালিকানা বা মালিকানার সন্দেহ বা অবকাশ থাকবে না। যে মালে চোরের মালিকানার অবকাশ থাকে অথবা যদি মালটি হয় জনগণের বা জনকল্যাণমূলক কোনো প্রতিষ্ঠানের, তবে এ মাল চুরি করলে 'হদ' প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ চোরের হাত কাটা যাবে না। তবে বিচারক তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী অন্য কোনো শাস্তি দেবেন।

২. মালটি হেফাজতে থাকতে হবে—অর্থাৎ তালাবদ্ধ স্থানে বা চৌকিদারের পাহারায় থাকতে হবে। অরক্ষিত স্থান থেকে চুরি হলে সেজন্য হাত কাটা যাবে না। এমনকি মাল সুরক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও হাত কাটা যাবে না। অবশ্য সেজন্য গুণাহ হবে এবং অন্য কোনো শাস্তির যোগ্য হবে।

৩. বিনা অনুমতিতে মাল নিতে হবে। যে মাল নেয়ার বা নিয়ে ব্যবহার করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হয়, আর সে যদি ঐ মাল একেবারেই নিয়ে যায়; তবে চুরির হদ জারি হবে না।

৪. মালটি গোপনে নিলে তা চুরি হবে। প্রকাশ্যে নিয়ে গেলে তা হবে ডাকাতি। আর ডাকাতির শাস্তিও ভিন্ন। ডাকাতির শাস্তির কথা সূরা মায়িদাহ্‌র ৩৩নং আয়াতে বলা হয়েছে। শাসক ও বিচারকগণ ডাকাতির অপরাধের তীব্রতার ভিত্তিতে (১) হত্যা করা (২) শুলীতে চড়ানো (৩) হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা (৪) দেশ থেকে বহিষ্কার করা। এ চারটি শাস্তির যে কোনো শাস্তি দিতে পারেন।-[মা'আরেফুল কুরআন-মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ)]

বাষট্টি

وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ اِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○ (الانعام : ١٣٩)

"তারা বলে এসব চতুষ্পদ জন্তুর পেটে যা আছে, তা কেবল আমাদের পুরুষদের জন্য; আর তা আমাদের মহিলাদের জন্য হারাম আর যদি তা মৃত হয় তা হলে তারা সবাই তাতে অংশীদার। তাদের এসব উক্তির কারণে তিনি (আল্লাহ্) তাদের অবশ্যই শাস্তি দেবেন। তিনি প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ।"–(সূরা আল-আন্'আম ঃ ১৩৯)

নারী অধিকার খর্ব করার জাহেলী যুগের একটি নমুনা

আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের কর্মগত ভ্রান্তি ও মূর্খতাসুলভ আচরণ প্রথার একটি বিশেষ দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস এবং প্রচলিত কু-প্রথার একটি ছিল এই যে, তাদের দেব-দেবী বা প্রতিমার নামে যেসব জন্তু ছেড়ে দেয়া হতো, সেগুলো জবেহ করার সময় পেট থেকে জীবিত বাচ্চা বের হলে তাকেও জবেহ্ করতো। কিন্তু তা শুধু পুরুষদের জন্য হালাল মনে করতো, আর মহিলাদের জন্য তাকে হারাম মনে করা হতো। অথচ জবেহকৃত জন্তুর পেটের বাচ্চাটা যদি মৃত হতো তবে তাতে নারী-পুরুষ সবাই অংশ নিতো। অন্যান্য অনেকগুলো মনগড়া বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রচলিত কু-প্রথাসমূহের মধ্যে এ প্রথাটাও চালু ছিল। আসলে আল্লাহর আলোর পথে না চললে যে মানুষ অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে থাকে এবং তাতে সামাজিক ইনসাফ বিনষ্ট হয়—এ হচ্ছে তারই এক উদাহরণ বিশেষ এবং নারীদের বঞ্চিত করার একটি নজীর। তাই আয়াতের শেষাংশে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করছেন, "ওদের এহেন উক্তির কারণে তিনি ওদের অবশ্যই শাস্তি দেবেন। তিনি প্রজ্ঞাময় সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।" পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তৎকালীন মুশরিকদের কতিপয় ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কু-প্রথার উল্লেখ করার পর আলোচ্য বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে। ওদের বে-ইনসাফী ও কু-প্রথাগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

১. তারা খাদ্যশষ্য ও ফলের কিছু অংশ আল্লাহর এবং কিছু অংশ দেব-দেবীর নামে পৃথক করতো। তারপর ঘটনাক্রমে যদি আল্লাহর অংশ থেকে কিছু অংশ দেব-দেবীর অংশে মিশে যেতো, তবে তা এমনি থাকতে দিতো।

পক্ষান্তরে দেব-দেবীর অংশ থেকে যদি আল্লাহর অংশের সাথে মিশে যেতো, তবে তা তুলে নিয়ে দেব-দেবীর অংশ পুরোণ করে দিতো। তাদের বাহানা ছিলো আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, তার অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রতিমাদের অংশ কমে যাওয়া উচিত নয়।

২. যেসব জন্তু দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দিতো তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য বলে ধারণা করতো। এতে প্রতিমার অংশ ছিল তাদের আরাধনা করতো। আর আল্লাহর অংশ ছিল তাঁর সন্তুষ্টির আশা করতো।

৩. মুশরিকরা নিজেদের কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দিতো বা হত্যা করতো।

৪. কিছু শষ্যক্ষেত্র প্রতিমার নামে ওয়াক্‌ফ করে দিতো। এর ফসল শুধু পুরুষরা ভোগ করতো। মহিলাদের দেয়া না দেয়া পুরুষদের এখতিয়ার। মহিলাদের কোনো দাবী করার অধিকার ছিলো না।

৫. চতুষ্পদ জন্তুর বেলায়ও এ একই নিয়ম জারি ছিলো। কোনো কোনো জন্তু কেবল পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট থাকতো।

৬. জন্তুর দুধ দোহন করতে, আরোহণ করতে ও জবেহ্ করতে তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতো না।

কোনো জিনিসকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করতে পারে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহর নির্দেশ নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পৌঁছানো হয়েছে। হালাল-হারাম, কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আল্লাহই নির্ধারণ করতে পারেন। সৃষ্টির সার্বিক কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই (স্রষ্টাই) সংরক্ষণ করতে পারে, তাই হালাল-হারামের সীমানা নির্ধারণ ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট। নিজের ইচ্ছেমত কোনো জিনিসকে হালাল-হারাম ঘোষণা করার অধিকার কোনো সৃষ্টির নেই। তা স্থির হতে পারে কেবল রাব্বুল আলামীনের নির্দেশেই। মুশরিকদের এভাবে হালাল-হারাম ঘোষণার অনধিকার চর্চার ফলে তৎকালীন নারী সমাজকে এভাবে নানান দিক থেকে বঞ্চিত করা হতো। একবিংশ শতাব্দির এই কথিত সভ্য যুগেও যে বা যারাই মানব কল্যাণ, মানবাধিকার, নারীর অধিকার ও মর্যাদা এবং শিশুর অধিকার সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব বিধি-বিধান প্রয়োগের ব্যর্থ চেষ্টায় শক্তি-সামর্থ ব্যয় করবে তারাও যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে না, তা এই অতীত ইতিহাস থেকেই অনুমান করা যায়।

সার্বিক মানব কল্যাণ ও মানবাধিকার নিশ্চিত হতে পারে একমাত্র রাব্বুল আলামীনের দেয়া বিধি-বিধানের মাধ্যমেই। মানবেতিহাস এ অমোঘ সত্যের জাজ্জল্যমান সাক্ষী। সুতরাং নতুন করে তা পুনঃ পরীক্ষা করে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। পরীক্ষিত জিনিসকে আরও পরীক্ষা করে দেখতে গেলে কেবল সময়েরই অপচয় হতে পারে, তাতে কোনোই ফলোদয় হবে না। বিশ্বের সচেতন বিবেক যত তাড়াতাড়ি এ মহাসত্যকে স্বীকার করে নেবে, তত দ্রুত তারা প্রকৃত কল্যাণের দিকে এগুতে সক্ষম হবে। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানব জাতির পরিচালনা-ক্ষমতাসম্পন্ন বিবেককে এ দিকে হিদায়াত করুন। আর মুসলিম মিল্লাতকে দিন তাঁর পক্ষ থেকে প্রকৃত সত্যানুভূতি, আত্মসচেতনতা ও দায়িত্ববোধ, আর বিশ্ব মানুষকে সত্য ও কল্যাণের পথে নিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা। আমীন।

তেষট্টি

وَيٰآدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (الاعراف : ١٩)

"ও আদম! তুমি আর তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। তোমরা দু'জনেই যেখান থেকে ইচ্ছা খাও, কিন্তু এ গাছটির কাছেও যেয়ো না। তাহলে তো তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৯)

আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতায় নারী-পুরুষ উভয়কেই চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়

আলোচ্য আয়াতে পৃথিবীর প্রথম নর-নারীর বাসস্থান ও অন্ন সংস্থান সম্পর্কিত নির্দেশের উল্লেখ রয়েছে। পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে মানব সৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসংগে সূরা আ'রাফের এগার নম্বর আয়াত থেকে আঠার নম্বর আয়াত পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। এ আয়াতগুলোতে মানব সৃষ্টির ইতিহাস ও শয়তানের শত্রুতার সূচনার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটির মর্মার্থ বুঝার জন্য পূর্ববর্তী আয়াত সম্পর্কে জানা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা তাতে বলেন, "আমি তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করলাম, তারপর তোমাদের আকৃতি দান করলাম ; অতপর ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো। এ নির্দেশ অনুযায়ী সবাই সিজদা করলো কিন্তু ইবলীস করলো না—সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, আমি যখন তোকে সিজদা করতে হুকুম দিলাম তখন তোকে সিজদা করতে বাধা দিলো কিসে ?" সে বললো, "আমি তো ওর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাকে সৃষ্টি করেছো আগুন থেকে আর ওকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে।" তিনি বললেন, "ঠিক আছে তুই এখান থেকে নেমে যা। এখানে অহংকার করার অধিকার তোর নেই। বের হয়ে যা। তুই তো ওদেরই অন্তর্ভুক্ত যারা নিজেরাই নিজেদের লাঞ্ছিত করতে চায়।" সে বললো, "আমাকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যেদিন ওদের উঠানো হবে।" তিনি বললেন, "তোকে অবকাশ দেয়া হলো।" সে বললো, "তুমি যেমন আমাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছো, আমিও তেমনি তোমার সরল-সত্য পথে ওদের জন্য ওঁত পেতে বসে থাকবো, ওদের সামনে-পেছনে, ডানে-বাঁয়ে সবদিক থেকে ঘিরে ধরবো—ওদের অধিকাংশকে তুমি শোকর-গুজার পাবে না।" আল্লাহ বললেন, "বের

হয়ে যা তুই এখান থেকে লাঞ্ছিত ও ধিকৃত হয়ে। নিশ্চিত জেনে রাখ, এদের মধ্য থেকে যারাই তোর অনুসরণ করবে তাদেরকে এবং তোকে দিয়ে জাহান্নাম ভরে দেবো।"

আলোচ্য আয়াতের পূর্বের আয়াতগুলোতে আদম সৃষ্টি ও শয়তানের অবাধ্যতা এবং বনী আদমের সাথে শয়তানের শত্রুতার সূচনা সম্পর্কে উপরিউক্ত কথাগুলো বলা হয়েছে। অতপর এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে লক্ষ্য করে তার চির শত্রু শয়তানের চক্রান্ত থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাবধানতা অবলম্বনের পথ বাতলে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আদমের সাথী হিসেবে হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করে তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে জান্নাতে বসবাস করার নির্দেশ দিয়ে বললেন, "ও আদম! তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে জান্নাতে বসবাস কর। আর জান্নাতের যেখান থেকে ইচ্ছা পানাহার কর। কিন্তু এ গাছটির ধারেও যেয়ো না—তাহলে তোমরা উভয়ে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।"

সূরা আল বাকারার ৪র্থ রুকূ'তেও বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সেখানে আলোচ্য আয়াতটির সাথে এ আয়াতের হুবহু মিল রয়েছে। সূরা আল বাকারার ৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَقُلْنَا يٰادَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
وَلاَ تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ (البقرة : ٣٥)

"আর আমি বললাম, "ও আদম ! তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে জান্নাতে বসবাস করো, আর দু'জনে এ থেকে স্বাচ্ছন্দে পানাহার করো। তবে এ গাছটির ধারেও যেয়ো না—তাহলে তোমরা উভয়েই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ৩৫)

একই বিষয়ের বর্ণনায় উপরোক্ত সূরা আল বাকারা, সূরা আল আরাফের দু'টো আয়াতেই জান্নাতে বসবাসের নির্দেশনায় আল্লাহ তা'আলা সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন হযরত আদম (আ)-কে ; আর এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তার স্ত্রীকে। বলেছেন ঃ

اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

"তুমি বসবাস করো তোমার স্ত্রীকে নিয়ে জান্নাতে" লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বসবাসের ব্যাপারে কেবল আদম (আ)-কেই সম্বোধন করেছেন। এ ব্যাপারে উভয়কে সম্বোধন করা হয়নি। আয়াতে বসবাসের ও

জীবন ধারণের ক্ষেত্রে আদমকেই উদ্দেশ্য করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কারণ, হাওয়া (আ) ছিলেন আদম (আ)-এর অধীন। আয়াতের পরবর্তী অংশে খানা-পিনার বিষয়ে উভকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, স্ত্রীগণের থাকার ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে স্বামীর উপর, কিন্তু আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চলার ব্যাপারে উভয়ই স্বতন্ত্রভাবে দায়ী। স্ত্রীর অবস্থান সংক্রান্ত যাবতীয় দায়-দায়িত্ব স্বামীর উপর ন্যস্ত হলেও আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনের ব্যাপারে উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে বিধায় এ বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে দায়ী।–(তাফসীরে মাযহারী অবলম্বনে)

আল্লাহ তা'আলা আদম-হাওয়ার বাসস্থান ব্যবস্থার সমাধান স্বরূপ এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও এতে বলে দেয়া হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে এসবের সীমারেখাও। আল্লাহর দেয়া সীমারেখা লংঘন করা হলে তার পরিণতি সম্পর্কেও সাবধান করে দেয়া হয়েছে।

সূরা আল আরাফের ২০নং আয়াত থেকে ২২নং আয়াত পর্যন্ত তরজমা থেকে পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

তারপর শয়তান তাদের উভয়কে (আদম-হাওয়া) ওয়াস্ওয়াসা দিল, যাতে তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয় (তাদের লজ্জাস্থান), যা তাদের কাছে গোপন ছিল। অর্থাৎ এমন ওয়াসওয়াসা দিল যাতে করে আদম-হাওয়ার বেহেশতী লেবাস থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে পড়ে। তারা বিবস্ত্র হয়ে পড়ে। সে বললো, "তোমাদের রব এ গাছ থেকে নিষেধ করার কারণ একমাত্র এই যে, এতে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা, চিরন্তন জীবন লাভ করে বসবে। সে তাদের উভয়কে কসম করে বললো, "আমি তোমাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকামী" এভাবে সে তাদের প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে ফেললো। শেষ পর্যন্ত যখন তারা উভয়ে ঐ গাছের স্বাদ আস্বাদন করলো, তাদের গোপন অঙ্গসমূহ তাদের সামনে খুলে গেল।

তারা নিজেদের অঙ্গ জান্নাতের পাতা দিয়ে ঢাকতে লাগলো। তখন তাদের রব তাদের ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদের ঐ গাছটি থেকে নিষেধ করিনি? আর তোমাদের বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ?"

মানুষের চির শত্রু শয়তান আদম-হাওয়াকে প্রতারিত করে বিপদে ফেলার জন্য তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে কসম করে তাদেরকে আল্লাহর কথা অমান্য করাতে সক্ষম হলো। তারা উভয়ে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল

খেলেন। অমনি তাঁদের বেহেশতী লেবাস খুলে গেলে তাঁরা লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য জান্নাতী গাছের পাতা শরীরে ধারণ করলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, সাধারণত একথা প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত যে, শয়তান প্রথমে বিবি হাওয়াকে প্রতারিত করতে সক্ষম হয়েছিল। পরে তাকে দিয়ে আদম (আ) -কে প্রতারিত করা হয়েছিল। কিন্তু কুরআন থেকে জানা যায় যে, আদম-হাওয়া উভয়কেই একই সময়ে শয়তান প্রতারিত করেছিল। কুরআন বলে ঃ

فَدَلَّـٰهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُـهُمَا

"সে দু'জনকেই প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে ফেললো, আর যখন দু'জনেই গাছটির স্বাদ আস্বাদন করলো তখন তাদের উভয়ের সামনে উভয়ের লজ্জাস্থান খুলে গেল।"—(সূরা আল আ'রাফ ঃ ২২)

শয়তান কর্তৃক আদম-হাওয়ার প্রতারিত হওয়ার ইতিহাসের একথাটি কুরআনে সুস্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু শয়তান প্রথমে বিবি হাওয়াকে প্রতারিত করেছে, অতপর তারই মাধ্যমে আদম (আ)-কে প্রতারিত করা হয়েছে। একথাটি গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করার বিষয়। কারণ এতে করে নারী জাতির নৈতিক, আইনগত ও সামাজিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করার ব্যাপারে সাংঘাতিক কাজ করেছে। আর এতে করে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, মানুষের যাবতীয় বিপর্যয়ের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার পেছনে নারীরা দায়ী। আল-কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে মূলতঃ এ ধরনের কাল্পনিক কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে আল্লাহর নাফরমানী করলে নারী-পুরুষ উভয়কেই চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়।

—(তাফহীমুল কুরআন অবলম্বনে)

وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۝ (الاعراف : ٨٠ ـ ٨١)

"আর লূতকে আমি নবী করে পাঠালাম। সে তার জাতিকে বললো, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছো যা তোমাদের আগে সারা বিশ্বে কখনো কেউ করেনি ? তোমরা যৌনবাসনা চরিতার্থ করার জন্য স্ত্রীদের ছেড়ে পুরুষদের কাছে গমন করছো। আসলে তোমরা একেবারেই সীমা লঙ্ঘনকারী জাতি।"–(সূরা আল আ'রাফ ৮০-৮১)

পৃথিবীর প্রথম জঘন্য অশ্লীলতা ও সেজন্য আল্লাহর গযব

হযরত লূত (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। ইব্রাহীম (আ)-এর পরিবারের মধ্যে শুধু সহধর্মিণী বিবি সারা ও ভ্রাতুষ্পুত্র লূত মুসলমান হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম (আ) তাদেরকে নিয়ে মাতৃভূমি ইরাক থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় চলে যান। হযরত লূত (আ) সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিশর ভ্রমণ করে ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। অতপর তাঁকেও নবুয়ত দান করে আল্লাহ্ তা'আলা জর্ডান ও বায়তুল মোকাদ্দাসের মধ্যবর্তী সাদুমের অধিবাসীদের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত লূত (আ) এখানেই অবস্থান করতেন। এ এলাকার ভূমি ছিল খুবই উর্বর ও শস্য-শ্যামল। সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল এ জায়গায়। কুরআনের ভাষায় মানুষের সাধারণ অভ্যাস হচ্ছে ঃ

كَلَّاۤ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰۤى ۝ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝ (العلق : ٦ـ٧)

"মানুষ যখন দেখে যে, সে কারো মুখাপেক্ষী নয়, তখন সে অবাধ্যতা শুরু করে দেয়।"–(সূরা আল আলাক ঃ ৬-৭)

হযরত লূত (আ)-এর জাতির সামনেও আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তারাও মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী ধনৈশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়ে পড়ে। তারা বিলাস-ব্যসন, কাম-প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, লজ্জা-শরম ও ভাল-মন্দের স্বভাবজাত

পার্থক্যও বিস্মৃত হয়ে যায়। তারা এমন প্রকৃতি বিরুদ্ধ নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে যা হারাম ও গুনাহর কাজ তো বটেই, অধিকন্তু তা সুস্থ স্বভাবের কাছে ঘৃণ্য এবং রুচি বিরুদ্ধও বটে। রুচিবান মানুষ তো দূরের কথা সাধারণ জন্তু-জানোয়ারও এ ধরনের আচারণের কাছেও যায় না। তারা নারীর পরিবর্তে পুরুষকে দিয়ে যৌন ক্ষুধা মিটায়।

হযরত লূত (আ) তার জাতিকে এ ধরনের জঘন্য, ঘৃণ্য, স্বভাব বিরুদ্ধ ও রুচীহীনতার কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন ঃ

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ۔

"তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজে প্রবৃত্ত হচ্ছো যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি।"–(তাফ্সীরে মা'আরেফুল কুরআন)

কুরআনের অন্যান্য স্থানে হযরত লূত (আ)-এর জাতির আরো কোনো কোনো নৈতিক অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের এমন এক অপরাধের কথা যা পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো কোনো মানুষ থেকে প্রকাশ পায়নি এবং যে কারণে সে জাতির উপর আল্লাহর ভীষণ আযাব নাযিল হয়েছিল। এ প্রকৃতি বিরুদ্ধ, ঘৃণ্য ও কদর্য কাজের দরুনই তারা দুনিয়ায় অশ্লীলতার স্থায়ী খ্যাতি লাভ করেছে।

আজকের পৃথিবীতে চরিত্রহীন লোকেরা এখনো এমন অপরাধ করেই চলছে। গ্রীক দার্শনিকরা এ জঘন্য অপরাধকে একটি নৈতিক গুণ ও সৌন্দর্যরূপে প্রতীত করার চেষ্টা করেছে। আর তাদের অপরাধে যতটুকু অপূর্ণতা ছিল তা পূরণ করে দিয়েছে ইউরোপ। ইউরোপীয়রা প্রকাশ্যে এ অশ্লীলতার স্বপক্ষে প্রচার কার্য চালায়। এমনকি জার্মানির মত একটি দেশের আইন-পরিষদ এ অশ্লীতাকে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছে। অথচ এতো এক সুস্পষ্ট ও অনস্বীকার্য সত্য যে, সমমৈথুন একান্তই প্রকৃতি বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা সকল জীব- জন্তুর মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন কেবল বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মানবজাতির ব্যাপারে বংশ রক্ষা ছাড়াও আরেকটি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষ মিলে গঠন করবে পরিবার এবং পরিবারের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে সমাজ ও সভ্যতা। প্রধানতঃ এ দু'টো উদ্দেশ্যেই মানবজাতিকে স্ত্রী-পুরুষ করে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও ভালবাসা স্থাপন করা হয়েছে।

নারী-পুরুষের দৈহিক গঠন ও মনস্তত্ত্ব নিজেদের পারস্পরিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। তাদের পারস্পরিক মিলন ও সংগমে

রক্ষিত হয়েছে স্বাদ-আস্বাদনের অপূর্ব ব্যবস্থা—যা যুগপৎভাবে যেমন করে আকর্ষণ তেমনি হয় আকর্ষিত ও উদ্বুদ্ধ। একাজের বিনিময়ও তারা লাভ করে তা থেকে। কিন্তু যে ব্যক্তি বা যে জাতি প্রকৃতির এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কাজ করে সমমৈথুনের সাহায্যে যৌন স্বাদ আস্বাদন করে, সে বা তারা একই সাথে কয়েক প্রকারের অপরাধ সংঘটিত করে থাকে। এক, নিজেই নিজের গঠন-প্রকৃতি ও মনস্তাত্বিক প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে আর তাতে এক বিরাট ও চরম বিকৃতি ও বিপর্যের সৃষ্টি করে ; যার ফলে উভয়ের দেহ-মন ও নৈতিকতার উপর অত্যন্ত খারাপ প্রভাব বিস্তার লাভ করে। দুই, সে প্রকৃতির সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ করে। কারণ যে স্বাদ আস্বাদন লাভ করার সঙ্গে কতগুলো দায়িত্ব ও অধিকার পূরণকে অনিবার্য করে দেয়া হয়েছে সে ঐ স্বাদ আস্বাদন করতে চায়, কিন্তু কোনো দায়িত্ব ও অধিকার পূরণকে বাদ দিয়ে। তিন, সে মানব সমাজের সাথে প্রকাশ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করে। সে সমাজ প্রতিষ্ঠিত তমদ্দুনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে উপকার লাভ করে কিন্তু সে অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা বহনের পরিবর্তে পূর্ণ স্বার্থপরতা সহকারে নিজের শক্তির এমন ব্যবহার করে যা সভ্যতা ও নৈতিকতার জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। সে নিজের সাথে একজন পুরুষের অস্বাভাবিক যৌন ক্রিয়া করে অন্ততঃ দু'জন নারীর যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার নৈতিক পতন ও বিপর্যয়ের দুয়ার খুলে দেয়।

জাতির এ পশুত্বের চেয়েও নিকৃষ্ট ধরনের নির্লজ্জতা ও অশ্লিলতা এতই নিম্নস্তরে পৌছে গিয়েছিলো হযরত লূত (আ) তাদের এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বললে তারা প্রতি উত্তরে লূত (আ)-কে বললো, "এরা তো বড্ড পবিত্রতা জাহির করছে, তোমরা এদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দাও।"

এভাবে তারা নিজেদের মধ্যে লূত (আ)-সহ তার সঙ্গী-সাথীদের মত নেক চরিত্রের লোকদের (যারা তাদের কল্যাণের দিকে ডাকছিলো এবং পাপ ও অন্যায় কাজের জন্য আপত্তি তুলছিলো) বরদাশ্‌ত করতে পারছিলো না। কারণ তাদের চোখে তো তাদের বদকাজগুলো ভাল কাজরূপেই দেখাচ্ছিলো। তারা পাপে এতবেশী মগ্ন হয়ে পড়েছিল যে, সংশোধনের কোনো প্রচেষ্টাই সহ্য করতে পারছিলো না। পাক-পবিত্রতার এ কতিপয় উপাদান (লূত ও তার সঙ্গী-সাথীগণ)-কে বহিষ্কার করে দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলো। এ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যাওয়ার পর আল্লাহর তরফ থেকে তাদের ধ্বংস করে দেয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর হলো। কেননা যে সমাজে সামগ্রিকভাবে পবিত্রতার এ

সামান্যতম উপাদান অবশিষ্ট থাকে না, সে সমাজকে দুনিয়ার বুকে বাঁচিয়ে রাখার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণই থাকতে পারে না। পঁচা ফলের ঝুড়ির মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত কয়েকটি ভাল ফল অবশিষ্ট থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ঝুড়িটিকে ধরে রাখা যায় ; কিন্তু সেই ভাল ফল কয়টি যখন তা থেকে বের করে নেয়া হয়, তখন ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করা ছাড়া এ ঝুড়ির আর কোনো উপযুক্ত স্থান থাকতে পারে না।-(তাফহীমুল কুরআন)

আল্-কুরআন ওদের শাস্তি সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছে। যেমন এখানে সূরা আ'রাফের ৮৪নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ○

"আমি তাদের উপর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। দেখ, এসব অপরাধীর পরিণতি কেমন ছিল।"

এখানে তো সংক্ষেপে এতটুকুই বলা হয়েছে। সূরা হূদে এ আযাবের বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ٧ -(هود : ٨٢)

"অতপর যখন আমার নির্দেশ এসে গেল আমি বস্তিটিকে উল্টে দিলাম, আর তাদের উপর বর্ষণ করলাম প্রস্তর স্তরে স্তরে।"-(সূরা হূদ ঃ ৮২)

সূরা হিজরের আয়াতে এ আযাব বর্ণনার পূর্বে বলা হয়েছে ঃ

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ○(الحجر : ٧٣)

"সূর্যোদয়ের সময় বিকট নাদ তাদের পাকড়াও করেছিলো।"

মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ) বলেন, এতে জানা যায় যে, প্রথমে আকাশ থেকে একটি বিকট চিৎকার ধ্বনী এবং তারপর অন্যান্য আযাব এসেছে। বাহ্যতঃ বুঝা যায় চিৎকার ধ্বনীর পর প্রথমে ভূ-খণ্ড উল্টিয়ে দেয়া হয়। অতপর তাদেরকে অধিকতর লাঞ্ছিত করার জন্য উপর থেকে পাথর বর্ষণ করা হয়। তাছাড়া এমনও হতে পারে প্রথমে পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয় এবং পরে ভূ-খণ্ড উল্টিয়ে দেয়া হয়। কারণ কুরআনের বর্ণনা পদ্ধতিতে আগে উল্লিখিত বিষয় আগে সংঘটিত হওয়া অপরিহার্য নয়। লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত

ভয়াবহ আযাবসমূহের মধ্যে ভূ-খণ্ড উল্টিয়ে দেয়ার আযাবটি তাদের অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজের সাথে বিশেষ সংগতিও রাখে। কারণ তারা স্বাভাবিক ও সিদ্ধ পন্থার বিপরীত কাজ করেছিলো।

সূরা হূদে বর্ণিত আয়াতসমূহের শেষে কুরআনে পাকে আরবদের হুশিয়ার করে একথাও বলা হয়েছে ঃ

وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۝ (هود : ٨٣)

"উল্টে দেয়া বস্তিগুলো এসব যালিমদের থেকে বেশি দূরে নয়।"

সিরিয়া গমণের পথে সবসময়ই সেগুলো তাদের চোখের সামনে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

সেই ভয়াবহ দৃশ্য পৃথিবীতে আজও বিদ্যমান রয়েছে। বায়তুল মোকাদ্দাস ও জর্ডান নদীর মাঝখানে আজও এ ভূ-খণ্ডটি 'লূত সাগর' বা 'মৃত সাগর' নামে পরিচিত। এর ভূ-ভাগ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক নীচে অবস্থিত। এর একটি বিশেষ অংশ নদীর আকারে এমন আছে যার পানি আশ্চর্য ধরনের, যাতে মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে 'মৃত সাগর' বলা হয়।-(মা'আরেফুল কুরআন)

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া স্বাভাবিক নিয়ম হলো মানব বংশ রক্ষা সমাজের প্রাথমিক ইউনিট পরিবার গঠন ও মানব সভ্যতার বিকাশ সাধনে নর-নারীর যৌথ ভূমিকা রাখা। সেজন্যে আল্লাহ্ তা'আলা নারী-পুরুষ সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ, প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর উভয়ের সম্পর্ক স্থাপন নীতি ও তা রক্ষার সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ আল্লাহর দেয়া সেই সীমারেখা প্রথম লঙ্ঘন করেছিলো লূত (আ)-এর সময়ে। আর পরিণামে তাদের উপর এমন ভয়ংকর আযাব নেমে এসেছিলো যার নিদর্শনাদি আজও পৃথিবীর মানুষের সামনে রয়েছে। আল-কুরআন আজকের বিশ্ব সমাজকে সেদিকটির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে উক্ত আয়াতসমূহে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো আজকের বিশ্বের কথিত বুদ্ধিজীবি ও প্রাচুর্যের সমাজ, এমনকি সঠিক জ্ঞানের অভাবে মুসলিম সমাজ আল্লাহর বিধানের অনুসরণ এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণে চরম উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে চলছে।

পাঁয়ষট্টি

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ (الاعراف : ٨٣-٨٤)

"অতপর আমি তাকে [লূত (আ)-কে] ও তার আহালকে নাজাত দিলাম। কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়; সেতো পেছনের লোকদের সাথেই রয়ে গেল। আমি তাদের উপর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। তারপর দেখ, ওসব অপরাধীর পরিণতি কেমন হয়েছে।"–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ৮৩-৮৪)

অসাধু নারী সাধু পুরুষের স্ত্রী হলেও তার নাজাত নেই

আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আযাব (পূর্বোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণিত) দিয়ে লূত (আ)-এর পুরো অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে ধ্বংস করে দিলেন। লূত (আ)-এর জাতির লোকেরা যখন তাঁর অবাধ্য হয়ে কেবল সেই অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতায় ডুবেই রইলো না, অধিকন্তু তারা এহেন মারাত্মক নৈতিকতা বিধ্বংসী কাজের বাধা সৃষ্টিকারী লূত (আ) ও তাঁর কতিপয় সঙ্গী-সাথীকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করলো ; তখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়ে গেল। তাদের আযাব থেকে লূত (আ) ও তাঁর অল্প কতক অনুসারীকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা লূত (আ)-কে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন শেষ রাতে তাঁর এক স্ত্রী ছাড়া সকল আহ্ল ও সংঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করেন। আর তারা যেন পেছনের দিকে ফিরে না তাকান। কারণ, লূত (আ) সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই মুহূর্ত বিলম্ব না করে আযাব এসে যাবে।

হযরত লূত (আ) আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তাঁর এক স্ত্রী ছাড়া বাকী আহলদের নিয়ে শেষ রাতে সাদুম ত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে দু' রকমের কথা আছে। এক, সে তাঁদের সাথে রওয়ানাই করেনি। দুই, সে তাঁদের সাথে রওয়ানা করে কিছু দূর গিয়ে আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে পেছনের দিকে অপরাধীদের দেখতে চেয়েছিলো। অমনি ওদের সাথে তাকেও আযাব এসে পাকড়াও করলো।

কুরআনে আল্লাহর বাণী,

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ـ (الاعراف : ٨٣)

"তার স্ত্রী ছাড়া তাকে ও তার আহলকে আমি নাজাত দিলাম।" এখানে 'আহ্ল' বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ) তাঁর তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে বলেন, 'আহ্ল' পরিবারকে বলা হয়। কোনো কোনো তাফসীরকারকের মতে তাঁর পরিবারে তখন মাত্র দু'টো কন্যা মুসলমান হয়েছিলো। কিন্তু তাঁর স্ত্রী মুসলমান হয়নি৭ আল-কুরআনের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ 'সমস্ত জনবসতির মধ্যে একটি ঘর ছাড়া কোনো মুসলমান ছিল না।' এতে বুঝা যায় যে লূত (আ)-এর ঘরের লোকই শুধু মুসলমান ছিল। সুতরাং তারাই আযাব থেকে মুক্তি পেল। অবশ্য তাদের মধ্যে তাঁর স্ত্রী অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন ঃ 'আহ্ল' অর্থ ব্যাপক। এতে পরিবারের লোকজন এবং অন্যান্য মুসলমানকেও বুঝানো হয়েছে। মোটকথা, মাত্র অল্প ক'জনই মুসলমান ছিল। তাদেরকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা লূত (আ)-কে শেষ রাতে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।–(মা'আরেফুল কুরআন)

হযরত লূত (আ)-এর স্ত্রী নবী স্বামীর অবাধ্য ও আল্লাহর নাফরমানদের আদর্শে বিশ্বাসী—তথা আল্লাহদ্রোহীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বিধায় নবীর স্ত্রী হয়েও আল্লাহর অযাব থেকে রক্ষা পায়নি। আল্লাহর সামগ্রিক আযাব তাকেও গ্রাস করে নিয়েছিলো। ইসলামের ইতিহাসে এমনি বহু নযীর রয়েছে। যেমন হযরত নূহ (আ)-এর ছেলে 'কেন্-আন্' নবী পিতার অবাধ্য ছিল বিধায় সর্বগ্রাসী প্লাবন তাকেও ধ্বংস করে দিয়েছিলো। অবাধ্য হলেও তো আপন ছেলে। তাই নবী নূহ্ (আ) তার নাজাতের জন্য আল্লাহর কাছে আরয করে বলেছিলেন ঃ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ 'আমার ছেলে তো আমার আহ্ল'। উত্তরে রাব্বুল আলামীন বললেনঃ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ 'সে তো তোমার আহল নয়।' এতে বুঝা যায় আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে নবী-রাসূলের একান্ত আপনজন হলেও নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে হযরত ইবরাহীম (আ) অগ্নি পূজক আযরের ছেলে হয়েও মুসলিম মিল্লাতের পিতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। সুতরাং কোনো মানুষের সম্পর্ক নয় বরং আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্ক তাদের হুকুম ও আদর্শ মেনে চলার মধ্যে নাজাত এবং অমান্য করার মধ্যে আযাব ও শাস্তি অবধারিত পরিণতি।

ছেষট্টি

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَامُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ط نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ط اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ٥(التوبة : ٦٧)

"মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা সকলেই পরস্পরের অনুরূপ ভাবাপন্ন। তারা অসৎকাজের প্ররোচনা দেয়, সৎকাজে বাধা দেয় এবং (আল্লাহর পথে ব্যয় করার ও কল্যাণজনক কাজে) তাদের হাত বন্ধ করে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। নিশ্চয় মুনাফিকরাই ফাসিক।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৬৭)

মুনাফিক পুরুষ-মহিলা উভয়ই সমাজে অপকর্ম ছড়ায় আর ভাল ও ন্যায় কাজে বাধার সৃষ্টি করে

আলোচ্য আয়াতে মুনাফিক নারী-পুরুষের মনোভাব ও তাদের কার্যক্রমের সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে মুনাফিক ব্যক্তি চাই সে পরুষ হোক, অথবা হোক স্ত্রী; তাদের উভয়ের স্বভাব স্বরূপ অভিন্ন। তাদের কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্যই এমন যে, তারা সমাজে অন্যায় ও গর্হিত কার্যক্রম ছড়িয়ে দেয়—সমাজকে অন্যায় ও মন্দ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। অথচ সমাজ সদস্যদের ভাল ও ন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

মুনাফিক তো তাকেই বলা হয় যার মধ্যে (نِفَاق) 'নিফাক' বা 'দ্বিমুখিতা' থাকে।

اَلَّذِىْ لَايُطَابِقُ ظَاهِرَه بَاطِنَه

অর্থাৎ যার ভিতরের অবস্থা তার বাহ্যিক অবস্থার অনুরূপ নয়। অর্থাৎ ভিতরের অবস্থাটা খারাপ।

এর মানে যার মনের ভাবধারা ও বাহ্যিক অবস্থা একরূপ নয়। সে-ই মুনাফিক। বস্তুতঃ মুনাফিক সে ব্যক্তি যে প্রকৃতপক্ষে ইসলামে বিশ্বাসী নয়, অথচ নিজেকে সে মু'মিন ও মুসলিমরূপে প্রকাশ করে।

হাদীস শরীফে মুনাফিকের তিনটি লক্ষণ বলে দেয়া হয়েছে। ১. কথা বলবে তো মিথ্যা বলবে, ২. ওয়াদা করলে তার বিপরীত কাজ করবে, ৩. তাকে কোনো কিছুর আমানতদার বানানো হলে সে তাতে খিয়ানত করবে। এ লক্ষণগুলো মুনাফিক পুরুষের মধ্যে যেমন লক্ষ্য করা যাবে, তেমনি মুনাফিক নারীর মধ্যেও এগুলো পাওয়া যাবে।

সূরা আত তাওবার উক্ত আয়াতে বর্ণিত চরিত্র সকল মুনাফিকের মধ্যে সমানভাবে বর্তমান। অন্যায় ও অসত্যের প্রতি আকর্ষণ এবং সত্য ও ন্যায়ের সাথে শত্রুতা তাদের সকলের। কোনো খারাপ কাজ করতে চাইলে তাদের সহানুভূতি, পরামর্শ, সাহস ও সহযোগিতা, সুপারিশ ও প্রশংসা সবকিছুই তারা নিয়োজিত ও উৎসর্গকৃত করবে। তারা আন্তরিকভাবে সেই খারাপ কাজে শরীক হবে, অন্যদেরকেও তাতে শরীক হওয়ার জন্য উৎসাহিত করবে। তাদের কথা ও চাল-চলন থেকে বুঝা যাবে এ অন্যায় অসত্য উৎকর্ষ লাভ করলে তাদের অন্তর যেন আরাম পায় আর চক্ষু শীতল হয়। পক্ষান্তরে সমাজে কেউ কোনো ভাল কাজ করতে শুরু করলে যেন এ খবরটাই তাদের জন্য দুঃসহ হয়ে পড়ে। এর ধারণা করলেও যেন তাদের কলিজা ফেটে যায়। এর প্রস্তাবনা তাদের মোটেই সহ্য হয় না। এরূপ কোনো সৎকাজের প্রতি কাউকেও এগুতে দেখলে তাদের অন্তর-আত্মা কেপে উঠে। তারা তখন সম্ভাব্য সকল পথেই তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই ভাল কাজ থেকে তাকে বিরত রাখার জন্য যে কোনো পথ ধরতে বা যে কোনো ব্যবস্থা নিতে তারা মোটেই কুণ্ঠিত হয় না। আর কাজটি সমাজে যাতে সফল হতে না পারে, বিস্তার লাভ না করে, সেজন্য তাদের চেষ্টার সামান্যতম ত্রুটিও করে না।

মোটকথা, অন্যায় কাজের জন্য তারা কারুণের মত ধনী, কিন্তু সত্য ও ন্যায় কাজে তারা একেবারেই গরীব।-(তাফহীমুল কুরআন)

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ-

এখানে মুনাফিক পুরুষদের সাথে মুনাফিক স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর উভয়কেই সমান অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে করে যেন তাদের এ বিষয়ে সাবধানতা আসে যে, তাদের পুরুষদের যে করুণ পরিণতি হবে তাদের মহিলাদেরও একই পরিণতি হবে। যদি তারা (নারীরা) স্বতন্ত্রভাবে নিজেদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর চেষ্টা না করে। দ্বীনের ব্যাপারে অধীনস্থ

হওয়ার ওযর মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং নর-নারী নির্বিশেষে সকলকেই নিজ নিজ মুক্তির জন্য নিজেকেই চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। এতে বুঝা যায়, মুনাফিকির খেলায় মহিলাদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

–(তাদাব্বুরে কুরআন– মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী)

সাতষট্টি

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○ (التوبه : ٦٨)

"আল্লাহ ওয়াদা করেছেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের এবং কাফিরদের জন্যে জাহান্নামের আগুনের। তাতে তারা চিরদিন থাকবে। তাই তাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের উপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, আর তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ৬৮)

মুনাফিক নর-নারী ও কাফিরদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জাহান্নাম

আলোচ্য আয়াতে মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীর জন্য আখিরাতের জীবনে কি পরিণতি হবে, সেই হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। মুনাফিক নর-নারী এবং কাফিরদের পরকালীন জীবনের শাস্তি হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম। তারা মূলতঃ এমনি ধরনের শাস্তির যোগ্য। বাস্তবে ইসলামের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও মুনাফিকরা কোনোভাবে বাহ্যিক দাবীর কারণে রেহাই পাবে না। বরং প্রকাশ্য কুফরীর কারণে কাফিররা যেমন চিরদিনের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, ঠিক তেমনিভাবে ইসলামের দাবীদার এসব গাদ্দারদেরও চিরদিনের তরে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করা হবে।

এ জাহান্নামের শাস্তিই তাদের জন্য যথেষ্ট অথবা তারা জাহান্নামের এমনি শাস্তি পাওয়ারই যোগ্য। এটা হচ্ছে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত—অভিসম্পাত।

তাদের এ শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার যাবতীয় দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। এ মুনাফিকরা এমন এক স্থায়ী আযাবে গ্রেফতার হবে যা থেকে তারা কখনো মুক্তি পাবে না।-(তাদাব্বুরে কুরআন)

মুনাফিকরা প্রধানতঃ দু' ধরনের। এক, যারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিরোধী হলেও কোনো দুনিয়াবী স্বার্থে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।

এরা ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো আর নতুন নতুন অপবাদ রটাতো। দুই, দ্বিধা-সংকোচকারী, এরা ইসলামকে তো সত্য দ্বীন মনে করতো বটে কিন্তু প্রথম প্রকারের মুনাফিকদের সাথে মেলামেশা করতো আর তাদের কথা-বার্তায়ও অংশগ্রহণ করতো। অতপর তাদের বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়লে তারা নানারূপ হীলা-বাহানা করে ওযর পেশ করতো ; বলতো এটা এ কারণে, ওটা এভাবে হয়ে গেছে। তাদের জবাবে বলা হতো, আচ্ছা যদি তোমাদের এসব ওযর গ্রহণ করাও হয়, তাহলেও তো কেবল তারাই রেহাই পেতে পারে যারা অন্যদের কথায় এমনটি করতো। কিন্তু যারা এসব বিশৃঙ্খলা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে বেড়ায় এবং অন্তরে ইসলামের শত্রুতা পোষণ করে তারা তো অবশ্যই শাস্তির যোগ্য।–(তাফসীরে হাক্কানী) সর্বাবস্থায় মুনাফিকীর মাধ্যমে মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলাদের সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ওরা যেন একই নীতি-আদর্শের রঙ্গে রঞ্জিত। ওদের চিন্তা-চেতনা ও কার্যক্রমের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কাফির ও মুনাফিকদের মধ্যে কার্যতঃ কোনো পার্থক্য নেই বিধায় ওরা উভয় শ্রেণীই চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

আটষট্টি

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰۤئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ (التوبة : ٧١)

"মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলাগণ পরস্পরের বন্ধু-সাথী। তারা সৎ ও কল্যাণের নির্দেশ দেয় আর অসৎ ও অকল্যাণ থেকে বিরত রাখে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা তো এমন লোক যাদের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই রহমত নাযিল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, বেশ হিক্‌মত ওয়ালা।"

–(সূরা আত তাওবা ঃ ৭১)

মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলা সমাজে সৎ ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করে আর অসৎ ও অকল্যাণ প্রতিরোধ করে

নিষ্ঠাবান মু'মিন ও মুনাফিকরা বাহ্যিকভাবে একই ইসলামের অনুসারীরূপে সমাজে বসবাস করে। মুনাফিকরা এমনি তো ইসলামের বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদি পালন করে থাকে কিন্তু বাস্তবে এবং প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ও মুনাফিকদের আমল-আখলাকে বিরাট পার্থক্য বরং বৈপরিত্ত্য বিরাজ করে। মু'মিনরা ভাল ও কল্যাণমূলক কাজে পরস্পরকে সহায়তা ও সহযোগিতা করে থাকে আর মন্দ ও অকল্যাণকর কাজ থেকে নিজেরা কেবল দূরেই থাকে না বরং সমাজে ওসব কাজে তারা বাধার সৃষ্টি করে। সমাজকে সুশৃঙ্খল রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। পক্ষান্তরে, মুনাফিকরা প্রকৃতপক্ষে এর বিপরীত কাজ করে থাকে। তারা করে ন্যায় ও সত্যের প্রতিরোধ আর অসৎ ও অকল্যাণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। তাদের বাহ্যিক রূপ সমাজকল্যাণধর্মী প্রদর্শিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা বয়ে আনে সমাজের জন্য চরম অকল্যাণ ও অমঙ্গল। এজন্যে সূরা তাওবার ৬৭নং আয়াত এবং এ ৭১নং আয়াতে মুনাফিক ও মু'মিনকে স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বা পৃথক উম্মতরূপে বিভক্ত করে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে।

এ দু'টো আয়াতে লক্ষ্য করা যায় যে, মুনাফিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে, بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ (পরস্পর একজন থেকে আরেকজন) আর মু'মিনদের সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (পরস্পর একে অপরের বন্ধু-সাথী) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুনাফিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ শুধুমাত্র বংশগত সমন্বয় ও উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। কাজেই তার স্থায়িত্ব দীর্ঘ নয় আর না তাতে সেই ফল লাভ করা সম্ভব হতে পারে, যা সম্ভব হয় আন্তরিক ভালবাসা ও আত্মিক সহানুভূতির মাধ্যমে। পক্ষান্তরে মু'মিনগণ একে অপরের আন্তরিক বন্ধু এবং সত্যিকার সহানুভূতিশীল।

–(মা'আরেফুল কুরআন–কুরতুবী থেকে)

মুনাফিকদের পরিচিতি ও আচরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের পুরুষ ও মহিলারা সবাই একই চিন্তা-চেতনা লালন করে থাকে। মুনাফিকীর লালনে উভয়ের চেষ্টা-সাধনা অভিন্ন। পক্ষান্তরে ঈমানদার তথা প্রকৃত মু'মিনদের ব্যাপারে বলা হয়েছে তারা ঈমানের দাবী পূরণে পরস্পর একে অপরের সাথী। বন্ধু, সহযোগী হিতাকাঙ্ক্ষী। মু'মিন বান্দারা যখন জান-মাল দিয়ে জিহাদে বের হয়, তখন মু'মিন স্ত্রীরা তাদের অন্তরায় হওয়ার চেষ্টা করে না, বরং তারা আন্তরিকতা সহকারে স্বামীদের উৎসাহিত করে এবং নিজে ত্যাগ-তিতিক্ষা, আন্তরিক দোয়া, নিজের অনাবিল আনুগত্য ও আমানতদারী দিয়ে জিহাদে সহযোগিতা করে থাকে। আর এভাবে নিজেও স্বামীর সাথে জিহাদের প্রতিদানের ভাগী হয়ে থাকে।–(তাদাব্বুরে কুরআন)

মুনাফিকদের অবস্থা হলো তারা অন্যায় ও অসত্যের প্রশিক্ষণ ও প্রতিষ্ঠা করে আর সত্য ও ন্যায়ের বিরোধিতা করে। তারা আল্লাহর পথে ব্যয় থেকে মুষ্টিবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে মু'মিনরা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা-অন্যায়ের প্রতিরোধ করে আর যাকাত আদায় করে আল্লাহর পথে ব্যয়ের হাত খোলা রাখে।

আল্-কুরআন বিভিন্ন স্থানে কাফির ও মুনাফিকদের একত্র করেই তাদের ব্যাপারে একই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। সূরা তওবার ৭৩নং আয়াত উদাহরণস্বরূপ পেশ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○ (التوبة : ٧٣)

"হে নবী আপনি কাফির এবং মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করুন। তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম, আর অত্যন্ত খারাপ প্রত্যাবর্তন স্থল।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৭৩)

কুফুরী ও মুনাফিকীতে নারী ও পুরুষ যারাই জড়িত তাদের স্বভাব-চরিত্র ও কার্যক্রম একই রকম। পার্থক্য শুধু নামের ও বাহ্যিকতার। কাফিররা ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু ; আর মুনাফিকরা হলো ছদ্ম শত্রু। এতদোভয়ের পুরুষ বা নারীর আদর্শিক ও চারিত্রিক সার্বিক সামঞ্জস্য আছে বিধায় উভয়ের চেষ্টা ও কার্যক্রম যেমন অভিন্ন, উভয়ের পরিণামও সে কারণেই অভিন্ন। সমাজে জনকল্যাণমূলক কাজে যেমন ঈমানদার পুরুষদের যথেষ্ট ভূমিকা থাকে, তেমনি ঈমানদার মহিলাদেরও অনুরূপ ভূমিকা ও উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিক পুরুষরা যেমন—সমাজে অসৎ কার্যক্রম ছড়ায় তেমনি কাফির ও মুনাফিক নারীরাও অসৎ কার্যক্রম ছড়িয়ে সমাজকে কলুষিত করে ছাড়ে। সুতরাং সমাজকল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক শান্তি নির্ভর করে মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও কার্যক্রমের উপর—মানুষের নারী বা পুরুষ হওয়ার উপর নয়।

والله اعلم وهو المستعان

সমাপ্ত

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।